কৃশানু

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষপূর্তি

কবিতা সংখ্যা

১৪২৪

কৃশানু

একটি মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষপূর্তি কবিতা সংখ্যা

১৪২৪

৩০/১এ, কলেজ রো, কোলকাতা - ৭০০০০৯
E-mail - krishanupatrika@gmail.com

সুদামকৃষ্ণ মণ্ডল-এর

উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ

গল্প মঞ্জরী
গল্প সংকলন

অস্তরাগ
উপন্যাস

আঁধারের বিষণ্ণতা
গল্প সংকলন

প্রকাশক : ইসক্রা
৬৭, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

কৃশানুর

অন্যতর প্রতিষ্ঠাতা

হঁরিপ্রসাদ ভৌমিক-এর

স্মৃতির উদ্দেশে।

প্রখ্যাত কবি ও প্রাবন্ধিক

রথীন কর

এর সাম্প্রতিক প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ

কবিতা

বিষাদ কর্নেট বাজে - পত্রলেখা - ৪০.০০ টাকা
মৃদুল রোদ্দুরে একা - সংস্কৃতিক খবর - ৪০.০০ টাকা
বাতিঘর অনেক দূর - কৃষ্ণসীস প্রকাশন - ৪০.০০ টাকা
Moments' Monuments - Pathak - Rs. 100.00

প্রবন্ধ সংকলন

বিবিধ প্রসঙ্গ অব্যয় ৩০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :
একুশ শতক, পাঠক, ধ্যানবিন্দু,
(কলেজস্ট্রীট এলাকা, কলকাতা)

ই-বই

মৃদুল রোদ্দুরে একা
রথীন কর

https://archive.org/details/BatigharAnekDur
https://archive.org/details/MridulRoddureEka

কৃশানু

পঞ্চাশ বর্ষ।। বিশেষ কবিতা সংখ্যা।। চৈত্র ১৪২৪

সূচিপত্র

স্কেচ :

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, চারু খান,
প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিল বিশ্বাস, গোপাল সান্যাল।

সম্পাদক :
মনন দাস

সহসম্পাদক :
শান্ত রায়

প্রচার ও জনসংযোগ :
সমীর বেতাল

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ :
প্রদীপ মণ্ডল

সম্পাদকীয়

কৃশানু পঞ্চাশ বছর পার করে নবীন হলো। বর্তমান সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে শুরু হলো তার পথ চলা। সীসার টাইপ, ঘুপচি কম্পোজঘর, সীসায় কালো হয়ে যাওয়া আঙুলে কম্পোজ, ডাকে আসা কবিতা, এসব পেরিয়ে এখন ডি. টি. পি।

ই-মেলে কৃশানু সারা বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত। দেশ-বিদেশ থেকে চলে আসছে লেখা।

ই-বই এর মাধ্যমে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে বসে পড়া যাবে কৃশানু।

ফেসবুকের মাধ্যমে বিশ্ব জুড়ে তার বন্ধু।

কৃশানুর কবি সাহিত্যিকদের ই-বই প্রকাশ, যার মাধ্যমে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে বসে পাঠক পড়ে নিচ্ছে বই। মোটামুটি বলা যায় কৃশানু এখন আন্তর্জাতিক!

কৃশানুর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

প্রভাস ভদ্র-র

গল্পগ্রন্থ

গল্প চল্লিশ

চল্লিশটি বিচিত্র স্বাদের গল্পগ্রন্থ
মূল্য : দেড়শো টাকা
সুবর্ণরেখা
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রাকৃতিক

ই-বই : পড়ার জন্য ক্লিক করুন
www.archive.org/details/Prakritik

নীল নীলা

ই-বই : পড়ার জন্য ক্লিক করুন
www.archive.org/details/NEELNEELA

কৃশানু'র দীর্ঘ সময়ের সম্পাদক (১৯৬৮ - ২০১৪)

দীনেশচন্দ্র সিংহ

কৃশানু'র আত্মপ্রকাশের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কৃশানুতে যোগ দেন দীনেশচন্দ্র সিংহ। বাংলার বিলুপ্তপ্রায় এক সঙ্গীতের ধারা - কবিগান - তাঁর গবেষণার বিষয়। পরবর্তীকালে এই বিষয়ের ওপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।

সর্বসম্মতিক্রমে দীনেশচন্দ্র সিংহের হাতে সম্পাদকের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। এরপর সেই তৃতীয় সংখ্যা থেকে ছেচল্লিশতম সংখ্যা পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি কৃশানুর সেবা করে গেছেন অর্থ দিয়ে, শ্রম দিয়ে। সমৃদ্ধ করেছেন লেখা দিয়ে। দুঃখের কথা তিনি কৃশানুর সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা দেখে যেতে পারেননি। তাঁর সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংক্ষেপে এখানে দেওয়া হল।

Born : 8th Feb, 1935, Lt. 16th June, 2014

Career :

He joined the university service in the University of Calcutta. While in the service, he pursued his studies and research and obtained his doctoral degree. He was awarded the Sir Asutosh Gold Medal, Sarojini Basu Gold Medal and Griffith Memorial Prize for research work on different topics. He retired as the Deputy Registrar of the University of Calcutta in 1995. He has been the editor of Bengali literary magazine Krishanu since 1968 and awarded by Paschim Banga Bangla Academi as editor.

Books :

* Ashutosh Mukhopadhyayer Shikshachinta.
* Noakhalir Mati O Manush
* Kabiyal : Kabigan (1977)
* Purbabanger Kabigan
* Purbabanger Kabiyal Kabisangeet (1990)
* Purbabanger Kabigan Sangraha O Paryalochana
* Shyamaprasad : Bangabhanga O Paschimbanga (2000)
* Nakuleshwar Geetimalya (edited)
* Prasanga : Kalikata Viswavidyalaya

Honours :

* Sir Asutosh Gold Medal
* Sarojini Basu Gold Medal
* Griffith Memorial Prize

কৃশানু'র কথা

দীনেশচন্দ্র সিংহ

পুনর্মুদ্রিত/দশমবর্ষ পূর্তি সংখ্যা থেকে

কৃশানু'র জন্মকথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের শিশু কাব্যগ্রন্থের 'জন্মকথা' কবিতাটি। 'এলেম আমি কোথা থেকে'—খোকার এই কৌতূহলী প্রশ্নের জবাবে মা বলেছেন—'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।' কৃশানু'র পরিকল্পকদের মনে কবে এই ইচ্ছার অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল, সে দিন-ক্ষণ আজ আর কারো স্মরণ নেই, তবে তার আদি কল্পকার হিসেবে যে দু'জনের নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তাঁরা হলেন—হরিপ্রসাদ ভৌমিক ও মদন দাস। হরিপ্রসাদ পেশায় শিক্ষক, নেশায় হাড়ে-হাড়ে সাহিত্যিক। পত্র-পত্রিকায় ইতিমধ্যেই কিছু কিছু লেখা বেরিয়েছে। মদন রুজিতে জুতো কোম্পানীর নিষ্প্রাণ মেসিনের রূপকার, রুচি রবীন্দ্রসঙ্গীতে, গল্প কবিতা লেখায়। দু'জনেই বাটানগরে এক নং এম্প্লয়ীজ হোস্টেলের একুশ নং ঘরের বাসিন্দা। পাশাপাশি সীটে রাত্রিবাস, পরস্পর সান্নিধ্যহেতু ওদের পেশাগত অনৈক্যের ব্যবধান ঘুচে গেল। উভয়ের ভাবনা চিন্তার সাজুয্যই একটা সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছার অঙ্কুর বলা যায়। উদ্দেশ্য—লেখা নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা গোষ্ঠীর দ্বারে দ্বারে না ঘুরে নিজেদের রচনা নিজেদেরই পত্রিকায় ছাপিয়ে হাত পাকানো এবং বাংলার স্ফুটনোন্মুখ সাহিত্যসেবীদের ছাপার অক্ষরে নাম দেখার সহজ সুযোগ করে দেওয়া।

বিশুদ্ধ সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে স্কুল-কলেজ জীবনে কিছু মাথা ঘামিয়েছেন এমন আরো কয়জনের সঙ্গে এরা আলাপ আলোচনা করলেন। হরিপ্রসাদ বাটানগর (২৪ পরগণা) থেকে খুঁজে খুঁজে যাদের বের করল তাঁরা হলেন—শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী—বাটা কর্মী, যাত্রা—নাটক পাগল, সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশে ঘা খাওয়া এবং বিশিষ্ট নাটক প্রকাশন সংস্থা 'লিপিকার' স্বত্বাধিকারী; মলিন দত্ত—বাটা কো-অপারেটিভের কর্মী, শ্রমিক আন্দোলনে অগ্রণী, সাহিত্যচর্চায় উৎসাহী; আশিস সেনগুপ্ত—গল্প কবিতা রচনায় অনেক চুল খোয়ানো স্কুল শিক্ষক; কল্লোল বিশ্বাস—ভারত সরকারের আই. এ. এস. গ্রেডের চাকুরে, কাব্যানুশীলনে রত, পদমর্যাদার অভিমান-মুক্ত সদাশিব ভালোমানুষ। আর, মদন যেহেতু হাওড়ার লোক; সুতরাং সে হাওড়া থেকে জোটাল—প্রবীর সাহা—লালবাজারে মসীজীবি, সরকারি কর্মচারী আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ, বাঁ হাতে সিগারেট বাগিয়ে ডান

হাতে শাবল চালানো'র মতো কলম মেরে গল্প লিখনে তৎপর; মৃন্ময় চক্রবর্তী— অধ্যাপনা ও সাহিত্য সাধনায় রত।

হরিপ্রসাদ যোগাযোগ করল তার বন্ধু শিক্ষক ও সাহিত্যোৎসাহী আশুতোষ বিশ্বাসের সঙ্গে। তিনি নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের স্মৃতি বিজড়িত—নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামবাসী। অধুনালুপ্ত 'আলোক সরণী' পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জীব সরকারকেও এনে সামিল করল। মানস-পত্রিকাকে কোনো বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ না রেখে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের উদীয়মান লেখকদের মিলন-কেন্দ্র করে গড়ে তোলাই উদ্যোক্তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল। প্রথম উদ্যোগেই তারা ২৪ পরগণা, কলিকাতা, নদীয়া ও হাওড়ার কিছু সংখ্যক সাহিত্য-যশোলিপ্সুকে একত্রিত করলেন। এরা নিজেদের মধ্যে কয়েকবার ঘরোয়াভাবে আলোচনা করলেন—উক্ত হোস্টেল ঘরে (হরিপ্রসাদ, মদন, আশিস, মলিন—চারজনই হোস্টেলের বিভিন্ন ঘরে সীটদার), বাটার পূজার চাতালে, গঙ্গার ধারে জেটিতে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ক্যান্টিনে, আবার কখনো বা দিলীপ ভট্টাচার্যের (বাটানগরে শ্রমিক আন্দোলনে চাকুরী-হারা শিক্ষিত দোকানদার, গল্প কবিতা লেখক, পরবর্তীকালে 'জীবন-শিল্পী সত্যজিৎ রায়' গ্রন্থের রচয়িতা) দোকানে বিস্কুটের টিনের ওপর বসে। বাটানগরের অনেক মিনি আঁতেলেকচুয়াল সন্ধ্যার দিকে এখানে ভীড় করতেন।

পত্রিকা নিয়ে জল্পনাকল্পনা চলাকালীন আরো যাঁদের সঙ্গে আধুনিক ভাষায় যাকে বলে 'লাইন' করা হলো, তাঁরা হলেন—রত্নেশ্বর বর্মণ—কয়লা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কর্মী, চৌখস গল্প ও সূক্ষ্ম চিন্তা ভাবনামূলক 'ফিচার' লিখনে সিদ্ধহস্ত; বকুল ঠাকুর—স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী, সাহিত্য সংস্কৃতির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে উৎসাহী; শ্যামল বসু—রাইটার্সে সরকারি কর্মে রত, এক লাইনও না লিখে বন্ধু বান্ধবদের সাহিত্য সেবার রসদ জোগাতে ব্যস্ত; এবং পিনাকীরঞ্জন গুহ গল্প কবিতা উপন্যাস প্রবন্ধ রচনায় সমদক্ষ, আশৈশব সাহিত্য সাধনায় সর্বত্যাগী।

নূতন পত্রিকা প্রকাশের প্রাক্কালে যেসব আইনগত রীতিনীতি আছে, এবারে সেগুলি পালন ও দায়দায়িত্ব ভাগাভাগির ব্যাপার। পত্রিকার সম্পাদকরূপে মনোনীত হলেন মৃন্ময় চক্রবর্তী ও আশিস সেনগুপ্ত। প্রকাশক ও মুদ্রক মলিন দত্ত। নামকাওয়াস্তে মালিকানা থাকলো মলিন, মদন, মৃন্ময় ও হরিপ্রসাদের নামে। কারণ এরা কেউ সরকারি চাকুরীরত নয়। তাই কোনো বাধা নেই। অতি উৎসাহে পত্রিকা মাসিক-রূপে প্রকাশ করা স্থির হলো। প্রকাশের স্থান—১৮ নং সূর্য সেন স্ট্রীট (রাখাল ঘোষ অর্থাৎ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজন পরিচিত রাখাল দা'র আস্তানা); আর ছাপাখানা নির্ধারিত হলো—বিবেকানন্দ রোডস্থ ভিক্টোরিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস। এমনি সময় কৃশানু-র পক্ষ থেকে কয়েকজন এসে প্রস্তাব করলেন—আপনি দীর্ঘদিন পত্রিকা প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত আছেন, তার সমস্যা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত আছেন, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন তাহলে কৃশানু কিঞ্চিৎ উপকৃত হয়। কৃশানু কলকাতা থেকে বের হবে। আপনিও চাকুরী-সূত্রে কলকাতা যাতায়াত করেন। পত্রিকার অফিস ও ছাপাখানা আপনার কর্মস্থলের কাছাকাছি—সুতরাং

আপনার পক্ষে দেখাশোনার বেশ সুবিধা হবে। আমি তাঁদের বক্তব্য মেনে নিয়ে কৃশানুতে যোগদানে রাজী হলাম।

আনুষ্ঠানিকভাবে কৃশানুর প্রথম পূর্ণাঙ্গ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো মার্কাস স্কোয়ারের পেছনে প্রবীরের মাতুলালয়ে। ইতিমধ্যে কিছু লেখাপত্র জোগাড় হলো। কিন্তু কিঞ্চিৎ মুদ্রা না হলে যে মুদ্রণ-কার্য শুরু করা যায় না। উক্ত বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো, পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সদস্যগণ পত্রিকা নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারা পর্যন্ত খুঁড়িয়ে চলার মতো কিছু কিছু নগদ অর্থ মাসিক চাঁদা হিসেবে দেবেন।

ছাপাখানায় মুদ্রণ কাজের তদ্বির তদারকের ভার ছিল আমার উপর। দুই সম্পাদক ও প্রকাশক সহযোগে আমাকে কাজ চালাতে হবে। কিন্তু প্রথম সংখ্যা প্রকাশের আগেই অন্যতম সম্পাদক আশিস সেনগুপ্ত ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করলেন। অনেকেই মনে মনে নিরাশ হলেন। তখন আর রেজিস্ট্রেশন সংশোধনের সময় নেই। সুতরাং তাঁর নাম সম্পাদক হিসেবে প্রথম সংখ্যায় রাখতেই হলো।

প্রথম সংখ্যাতেই নিয়মাবলীর মধ্যে ঘোষিত হলো—'প্রতিশ্রুতিবান নবীন লেখক লেখিকাদের রচনা প্রকাশে আমরা উৎসাহী। নাম নয়—লেখার মান আমাদের একমাত্র বিবেচ্য।' এই ঘোষণাই পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হলো—'কৃশানু মুখ্যত নবীন লেখকদের মুখপত্র। কৃশানুতে রচনা প্রকাশের জন্য তদ্বির করতে হয় না'—এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণায়। বস্তুতঃ অদ্যাবধি কৃশানু'তে গোষ্ঠী বহির্ভূত যত লেখকের লেখা প্রকাশিত হয়েছে তা ইদানীংকার আর কোনো পত্র-পত্রিকার হয়েছে কিনা জানা নেই। প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত বারটি বিভিন্ন ধরনের রচনার মধ্যে মাত্র দু'টি রচনা ছাড়া (হরিপ্রসাদ ও কল্লোল বিশ্বাস) বাকি দশটি রচনাই বাইরের লেখকদের। তারমধ্যে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্প 'একটি কুকুরের মৃত্যু', নাট্যকার রতন ঘোষের একাঙ্কিকা 'পাপ পূণ্য' এবং সমরেন্দ্র সিংহ রায়ের 'স্মৃতি-বিস্মৃতি' পর্যায়ে নদীয়ার প্রাচীন গ্রাম 'শিবনিবাস' নামে সচিত্র প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাত ফর্মা পত্রিকার দাম মাত্র এক টাকা। প্রথম প্রকাশ—আষাঢ়, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ।

দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৭৫-র শারদীয় সংখ্যা। গল্প কবিতা প্রবন্ধ নিয়ে পাঁচমিশেলী শারদীয় সংখ্যার বারটি রচনার মধ্যে চারটি মাত্র কৃশানুভূক্ত লেখকদের। তাঁরা হলেন—মদন, রত্নেশ্বর, পিনাকী ও দীনেশ। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে আশিস সেনগুপ্তের শূন্যস্থানে আমাকে অন্যতম সম্পাদকরূপে মনোনীত করা হলো।

দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অপর সম্পাদক মৃন্ময় চক্রবর্তীও কৃশানু'র সম্পর্ক ছাড়লেন। তৃতীয় সংখ্যা থেকেই আমার একার ঘাড়ে সম্পাদনার পুরোপুরি দায়িত্ব চাপান হলো। সে বোঝা আজ দশ বছর ধরে টেনে চলেছি। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এসব রদবদল হেতু আমাদের বারবারই 'ডিক্লারেশন' পরিবর্তন করতে কোর্টে ধর্ণা দিতে হয়েছে। তৃতীয় সংখ্যা থেকেই কৃশানু দ্বিমাসিক বলে ঘোষিত হলো।

তৃতীয় সংখ্যার পরই কৃশানু'র ওপর আচমকা বজ্রাঘাত নেমে এলো। বাইশে

ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ মাঝরাতে হরিপ্রসাদ অত্যন্ত আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করলো। রাত এগারোটা পর্যন্ত যার সঙ্গে কৃশানু'র পরবর্তী সংখ্যা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করেছি, রাত তিনটায় সেই সুস্থ প্রাণোজ্জ্বল লোকটার মৃত্যু-সংবাদ শুনে মনের অবস্থা কালিকলমে ধরে রাখার চেষ্টা বৃথা। সেদিন শেষরাতে যখন একে একে রত্নেশ্বর, মলিন ও বকুলের বাড়িতে তাদের শীতের শেষরাতের ঘুম ভাঙিয়ে হরিপ্রসাদের মৃত্যু খবর দিতে গেছি, তখন একটি কথাই আমাদের সকলের মনে বিলীয়মান শুকতারার মতো উঁকি দিচ্ছিল যে, এ মৃত্যু শুধু হরিপ্রসাদের নয়, আমাদের সকলের প্রিয় কৃশানু'রও বোধ হয় অন্তিম কাল ঘনিয়ে এলো। কাঁটাপুকুরের লাসকাটা টেবিল থেকে দুই দিন পর হরিপ্রসাদের মৃতদেহ নিয়ে আমরা সবাই কেওড়াতলা গেলাম। সেখানে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে সে-দেহ চালান করে দিয়ে আমি, রত্নেশ্বর, বকুল, মদন, মলিন, শ্যামল, প্রবীর প্রভৃতি বন্ধুরা পামগাছ তলায় বসে ভারতের সংবাদপত্র রেজিস্টারের নিকট প্রেরিতব্য প্রথম বারের মতো বার্ষিক বিবরণী তৈরি করতে করতে এই সিদ্ধান্ত নিই যে আর কিছু না হোক, অন্তত হরিপ্রসাদের স্মৃতিতেই কৃশানু'কে বাঁচিয়ে রাখা হোক।

হরিপ্রসাদের মৃত্যু সংবাদ বুকে নিয়ে এবং রেজিস্ট্রেশন নং 'আর. এন. ১৬৫৩৩/৬৮' চিহ্নিত হয়ে চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যারূপে বের হলো। আকার ক্রমেই ক্ষীয়মান, মাত্র পাঁচ ফর্মা—যা আজো কৃশানু'র সাধারণ সংখ্যার স্ট্যান্ডার্ড আয়তন। এ ক্ষুদ্র সংখ্যার তাৎপর্য কিন্তু কম নয়। প্রথমতঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন মিত্র মহাশয়ের 'নোয়াখালীর নবজীবন' নামে রচনাটি এ সংখ্যা থেকে শুরু হয়। তিনি বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ও প্রবীণ বিপ্লবী। পরবর্তী জীবনে পরাধীন দেশে আদর্শ শিক্ষকমণ্ডলীর অন্যতম শেষ প্রতিনিধি। নোয়াখালী জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের এই ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার মূল্যবান তথ্য ও উপাদানরূপে গণ্য হবে। দ্বিতীয়তঃ দীনেশচন্দ্র সিংহের পূর্ব বাংলার কবিগানের উপর ভিত্তি করে রচিত 'কবি-কাহিনী'র দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত (প্রথম পর্যায় প্রকাশিত হয় অধুনালুপ্ত 'রঞ্জন' পত্রিকায়)। পরবর্তীকালে এই রচনাই 'কবিয়াল কবিগান' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে এ সম্পর্কে একক ও অনন্য প্রকাশনরূপে সুধীসমাজে সমাদৃত হয়েছে। তৃতীয়ত প্রভাস ভদ্র—যিনি খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের কর্মী হিসেবে শুধু পেটের নয়, বক্তব্য-ধর্মী গল্প রচনায় মনের খোরাকও জোগান, তার কৃশানু'তে যোগদান। তিনি অধুনালুপ্ত 'প্রত্যয়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কালি কলম ছাড়া তুলিতেও প্রভাসের কিছু অধিকার থাকায় কৃশানু'র সাজসজ্জা ও অলঙ্করণের ভার এখন থেকে মদন ও প্রভাসের উপরই ছেড়ে দেওয়া হলো।

প্রথম বৎসর পাঁচটি সংখ্যা বের হলো। দ্বিতীয় বৎসরের অবস্থা আরো সঙ্গীন। প্রতি দু'টি সংখ্যার যুগ্ম প্রকাশে মাত্র তিনটি সংখ্যায় বৎসর শেষ করতে হলো; অর্থাৎ ত্রৈমাসিকের চেয়েও এক সংখ্যা কম। প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা মিলে ১৩৭৭ সালের শারদীয় সংখ্যা 'পূর্ববাংলা সংখ্যা' রূপে বের হলো—দুই বঙ্গের লেখকদের রচনা-সমৃদ্ধ হয়ে। সে সময়

পূর্ববঙ্গে অন্ধ ধর্মীয় বন্ধন অনেকটা আল্‌গা করে দুর্জয়ী জাতীয়তাবাদী শক্তি বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে, নব চেতনার প্লাবনে সে দেশের ছাত্র-যুব ও বুদ্ধিজীবি সমাজকে দিশেহারা করে তুলেছিল। তারই একটা সংহত শৈল্পিক রূপদান করেছিলাম 'পূর্ববাংলা সংখ্যায়'। এই সংখ্যার সার্থক রূপায়ণে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নারায়ণ চৌধুরী, কৃষ্ণ ধর, মিহির আচার্য, মিহির সেন মহাশয়ের সাহায্য বিশেষভাবে পেয়েছি। কৃশানু'র দশ বৎসরে প্রকাশিত সংখ্যা সমূহের মধ্যে এটি এক স্মরণীয় সংখ্যা হয়ে রয়েছে। পরবর্তীকালে বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে যখন পশ্চিম বাংলায় বুদ্ধিজীবী মহল অনেকটা আবেগে এবং কিছুটা হুজুগে উদ্বেল হয়েছিলেন, তখন অনেক ছোটখাট পত্রিকা ছাড়া দেশ, অমৃত, পত্রিকাও 'পূর্ববঙ্গ সংখ্যা' বের করে এবং কৃশানুতে প্রকাশিত অনেক গল্প কবিতাই পুনর্মুদ্রিত করে। তজ্জন্য অবশ্য কোনো স্বীকৃতি ছিল না।

১৩৭৭ সনের শারদীয় সংখ্যা থেকে প্রত্যেক শারদীয় সংখ্যাই গল্প-সংখ্যা রূপে বের হচ্ছে। অবশ্য কৃশানু-অনুরাগী কবি বন্ধুদের মুখ চেয়ে ১৩৮৩'র শারদীয় সংখ্যা থেকে কবিতাও সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তৃতীয় বৎসরে চারটি সংখ্যা বের করে ত্রৈমাসিকের মর্যাদা রক্ষা করা গেছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের স্মরণে ৩য় বর্ষ/৩য় সংখ্যার সঙ্গে 'বাংলাদেশ ক্রোড়পত্র' বের করা হয়েছিল।

পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে প্রেস ও প্রকাশের স্থান পরিবর্তন করতে হলো অনিবার্য কারণে। দীর্ঘ চার বৎসরাধিক কাল ভিক্টোরিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌-এর বীরেন পাল মহাশয় মুদ্রণ-ব্যয় পরিশোধের ব্যাপারে যে ধৈর্য্য ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন তা পত্রিকার শৈশবাবস্থায় বিশেষ উপকারে এসেছিল। শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয়ের 'লিপিকা'র ঠিকানায় (৩০/১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯) কৃশানু'র দপ্তর তুলে আনা হলো। তিনিই জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্সের সঙ্গে পত্রিকা মুদ্রণের ব্যবস্থা করে দিলেন। ৮ম বর্ষ/৪র্থ সংখ্যা পর্যন্ত এখানেই কৃশানু ছাপা হলো। পরে সেখানকার দেনাপাওনা মিটিয়ে লিটল ম্যাগাজিন মুদ্রণে খ্যাত 'ব্যবসা বাণিজ্য প্রেসে' কয়েক সংখ্যা মুদ্রিত হলো। কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে অনর্থক অপ্রীতিকর আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়ায় আমরা ওখান থেকে সরে এসে অন্যত্র পত্রিকা মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছি। লিটল্‌ ম্যাগাজিনের তিনটি বিশেষ লক্ষণ যথা—অনিয়মিত প্রকাশ, ক্রমাগত প্রেস বদল এবং ছাপাখানার টাকা মারা। আমরা প্রথম দুটি সর্ত পালন করেছি, কিন্তু তৃতীয় সর্ত পূরণে ব্যর্থ বলে দুঃখিত!

ইতিমধ্যে পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কেউ কেউ চাকুরীসূত্রে স্থানান্তরে যেতে বাধ্য হলেন। কল্লোল বিশ্বাস চলে গেছে দিল্লী; প্রবীর গেছে হাজারিবাগ। তবু তাঁরা কৃশানু'কে ভোলেনি। দূর থেকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করে যাচ্ছে। আবার কেহ বা বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হয়ে পড়ায় পত্রিকার সঙ্গে আগের মতো সক্রিয় যোগাযোগ রাখতে পারছিলেন না। এমন সময় গেছে যে কৃশানু মাত্র চারটি লোকের ওপর নির্ভর করে আত্মরক্ষা করেছিল এবং বাটানগরে প্রভাস ভদ্র'র 'বিচিত্রা' নামক সৌখীন দ্রব্যের দোকানটিই কৃশানু'র হেড-কোয়ার্টার হয়ে উঠেছিল। পত্রিকার এই কোণঠাসা অবস্থায়

কয়েকজন নতুন লেখক ও পৃষ্ঠপোষক এসে স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গী হয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুই ইঞ্জিনীয়ার সাহিত্যিক—জ্যোৎস্নাময় বসু (গল্প উপন্যাস ও নাটক রচনায় ভীষণ তৎপর) ও অজিত হাজরা (গল্প ও উপন্যাসে পাকা হাত) কাগজ ও মুদ্রণ ব্যয়-বৃদ্ধি হেতু পত্রিকার চরম আর্থিক সঙ্কটে জ্যোৎস্নাবাবুর সহযোগিতা পত্রিকার প্রাণ রক্ষায় অনেকখানি সাহায্য করেছে। সে সঙ্গে আর যাঁর নাম করতে হয় তিনি হলেন কিরণচন্দ্র মৈত্র। কর্মস্থলের অস্বাভাবিক কাজের চাপের মাঝেও ইনি গল্প ও নাটক রচনায় অকৃপণ। প্রভাস তার বন্ধু, গাল্পিক ও ঔপন্যাসিক অসীম চক্রবর্তীকে এনে আমাদের সাহিত্য-সাথী করেছে। আর এক তরুণ গল্পলেখক ও কবি অনুপকুমার আচার্যও কৃশানু-দরদী। কবি প্রশান্ত রায় (অধুনা আদ্যক্ষর কর্তন করে শান্ত রায়), উঠতি কবি রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বপন মজুমদার, কাশীনাথ দাশ চাকলাদার, প্রণব পাল, ধ্রুব বসু ও জীবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিসুলভ মমতাবশতঃ কৃশানু'র একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। দূর থেকে যেসব লেখক অনুরাগী কৃশানু'কে নিজেদের কাগজ মনে করে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে দেরাদুনের কবি মীনা ভৌমিক, সিউড়ীর গল্পকার-ঔপন্যাসিক অমিয় চৌধুরী, মেদিনীপুরের গল্পকার সুনীল কোনার, রামপুরহাটের কবি রথীন কর-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কৃশানু'র পরিচালন-ব্যবস্থা আরো সুনিয়ন্ত্রিত করতে, ব্যাপকতর ভিত্তিতে তার প্রচার ও প্রসার ঘটাতে এবং উৎসাহী ও প্রতিশ্রুতিবান লেখক-লেখিকাদের কৃশানু সম্পর্কে আগ্রহান্বিত করে তুলতে কিছুদিন পূর্বে 'কৃশানু সাহিত্য সংস্থা' গঠন করা হয়েছে। লেখক সদস্যগণ ছাড়াও তাতে 'নাট্য লিপিকা' পত্রিকার সম্পাদক সুনীল চক্রবর্তী, দীপঙ্কর পাল, অমল গুহ প্রভৃতি সাহিত্য-রসিক বন্ধুদের অকৃপণ পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে যাচ্ছি।

অস্বীকার করে লাভ নেই—বিজ্ঞাপন ছাড়া শুধু মাত্র নগদ বিক্রি ও গ্রাহক চাঁদায় কোনো পত্রিকা চলে না। বিজ্ঞাপনের কথায় মনে পড়ে পরলোকগত দিলীপ গুপ্তের কথা। তখন তিনি বাটা সু কোম্পানির পাব্‌লিসিটির কর্ণধার। বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের পরমবন্ধু দিলীপ গুপ্তের কাছে বিজ্ঞাপনের জন্য যখন প্রথমবার যাই, তখন তিনি একটি কথাই বলেছিলেন—পত্রিকার মতো পত্রিকা বের করুন—বিজ্ঞাপন দেবো। একদিনে দক্ষিণে গড়িয়া থেকে উত্তরে বি. টি. রোড পর্যন্ত বিশ পঁচিশ জায়গায় ধর্ণা দিয়েও একটি বিজ্ঞাপনের আশ্বাস পাইনি—এমন দিনও গেছে। বিজ্ঞাপনের সূত্র সন্ধানে ও সুপারিশ সংগ্রহে আমরা বিগত দশ বছর বন্ধুবান্ধব, পরিচিতের পরিচিত তস্য পরিচিত, কাউকে কম জ্বালাতন করিনি! সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন ও প্রচার বিভাগের গুণগ্রাহী সহায়তাকারী বন্ধুদের অনেকের কথাই এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নাম প্রকাশ সমীচীন নয় বলে বিরত রইলাম। তবু এর মধ্যে অনিল দাশগুপ্ত, অধীর বল, রামদুলাল মিত্র, নারায়ণ বিশ্বাস, পুলিন চ্যাটার্জি প্রভৃতি বন্ধুদের নামোল্লেখ না করে পারলাম না। সেইসঙ্গে স্মরণ করি ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ বিজলী-র নিঃস্বার্থ সাহায্য।

আজ আমরা কৃশানু'র দশম বর্ষ পূর্তি উৎসব পালন করছি। স্বল্পায়ু, অকালে মৃত,

লিটল ম্যাগাজিনের জন্য খ্যাত বাংলা সাহিত্য পত্রিকার ইতিহাসে এ এক অঘটন বলা চলে।

প্রথমাবধি একটা জিনিষ আমরা পরিহার করে চলেছি—তা হলো লেখার জন্য সাহিত্যজীবিদের দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দেওয়া। তাই সাহিত্যের বড় বাজারে আমাদের তেমন কোনো পরিচিতি নেই। যে স্বল্পসংখ্যক নামী লেখকের রচনা কৃশানু'তে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি ছোট পত্রিকার প্রতি তাঁদের স্বাভাবিক প্রীতির প্রতীক। আমরা আনন্দিত যে কুক্ষিগত সাহিত্যের বাজারে কৃশানুকে এক উন্মুক্ত গবাক্ষরূপে খাড়া করতে পেরেছি। বাংলা ও বাংলার বাইরের অনেক অজ্ঞাত অখ্যাত লেখককে আমরা পাদপ্রদীপের আলোয় আনার ব্যবস্থা করেছি। দশ বছরে অন্ততঃ তিন শতাধিক কবির কবিতা কৃশানু'তে বেরিয়েছে।

যারা প্রাথমিক ধাপ থেকে কৃশানু'র সঙ্গে জড়িত তাঁদের সবাইকে 'চাল্‌শে' ধরেছে; কেহবা প্রব্রজ্যার পর্যায়ে পা বাড়িয়েছেন। আমি নিজে দশ বছর পূর্বে মাথা ভর্তি কাঁচাচুল নিয়ে কৃশানুতে যোগ দিয়েছিলাম। আজ তার অল্প ক'গাছাই বাকি আছে। তার বিনিময়ে—কি পেয়েছি আর কি পাইনি, সে হিসাব মেলাতে মন মোর নহে রাজি! কৃশানু আমাদের দৈনন্দিন ধ্যান ধারণা চিন্তাভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। প্রতি বছর শারদীয় সংখ্যা প্রকাশের পর কার্জন পার্কে, গড়ের মাঠে, কফি হাউসে, বিচিত্রায় আমাদের মিটিং বসে। সে মিটিং-এর মুখ্য আলোচ্য বিষয়—কৃশানু আর বের করা হবে কিনা! মাঝে মাঝে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—যথেষ্ট হয়েছে, এবার কৃশানু'র জন্য শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করা হোক। কিন্তু পরক্ষণেই, কবির ভাষায়—'ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে'। 'কৃশানু নেই'—এই কথা ভাবতে অনিচ্ছুক বন্ধুরা আবার কোমর বেঁধে লেগে যান— দেখা যাক, আর এক বছর চালানো যায় কিনা। এভাবেই দশ বছর চলছে। কৃশানু'র পরিচালক, লেখক, গ্রাহক, পাঠক মিলে এক বৃহৎ পরিবারের মধ্যে বাস করছি যেন আমরা। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে যে মতান্তর হয়নি তা নয়; কিন্তু তা মনান্তরে গিয়ে দাঁড়ায়নি কখনো। সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি নিজেরাই মিটিয়ে নিয়েছি। কৃশানু'কে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দিইনি। অপরিচিত জায়গা থেকে অজ্ঞাতনামা লেখকলেখিকাদের লেখার সঙ্গে অনুরোধ, অনুনয়, আবদার, অভিমান ভরা চিঠিগুলিই কৃশানু'কে বাঁচিয়ে রাখার অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে। পত্রের মাধ্যমেই অনেকের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। অজানাকে জানবার দূরকে নিকট করার এমন সুন্দর যোগসূত্রটিকে বাঁচিয়ে রাখতে তাই আমাদের অসীম আগ্রহ।

হবি ও সমিধ স্বরূপ বিজ্ঞাপন জুগিয়ে যারা কৃশানু জ্বালিয়ে রেখেছেন তাদের জানাই ধন্যবাদ; আর আমাদের লেখা পড়ে যারা রুষ্ট বা তুষ্ট হন, অথচ কৃশানু পেতে দেরি হলে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন—'কি দাদা, পত্রিকা পাচ্ছি না কেন' সেসব অকৃত্রিম দরদী পাঠক-গ্রাহকদের জন্য রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

প্রকাশকের কলমে কৃশানুর কথা

অতিক্রান্ত অর্ধশতাব্দী। বিস্মিত হতে হয়। পঞ্চাশ বছর আগে নিজ হাতে রোপন করা যে বীজটি কয়েকটি পাতা মেলে পৃথিবীর আলো দেখেছিল আজও তা সবুজ সজীব! আমার সৌভাগ্য, তার সুবর্ণজয়ন্তী দেখতে পেলাম। মানুষ দিতে পারে না আয়ু, সে শুধু সহায়তা করতে পারে, রসদ জোগাতে পারে, কিন্তু জীবিত থাকা— সে আয়ুর জোর। এমন অনেকবার হয়েছে কৃশানু'র যাই যাই অবস্থা। একবার পরিচালক মণ্ডলীর সভায় একজন সদস্য তো বলেই বসলেন—পরবর্তী সভায় কৃশানু'র শেষ সংখ্যা প্রকাশ করে ইতি ঘোষণা করা হোক। আমি বললাম—মৃত্যু তো দিনক্ষণ ঘোষণা করে আসে না, কৃশানু'র যদি মৃত্যু হয় আপনিই হবে। কিন্তু কৃশানু'র আয়ুর জোর আছে, যতবার এমন অবস্থা হয়েছে ততবারই কিছু মানুষ পাশে এসে সহায়তা করেছেন, যত্ন করেছেন, কৃশানু বেঁচে উঠেছে। কৃশানু দেখছি দীর্ঘায়ু, হয়ত সে শতাব্দী অতিক্রম করবে। কিন্তু ভয় হয়, হাল ধরবার নবীন প্রজন্ম কোথায়? বর্তমানের ধারক বাহক সকলেই তো বৃদ্ধ। হয়ত আমাদেরই অক্ষমতা, আমরা নবীনদের খুঁজে এনে যুক্ত করতে পারিনি।

এই যোগ্যতা ছিল হরিপ্রসাদ ভৌমিকের। মানব সম্পদ খুঁজে এনে সংঘবদ্ধ করে গড়ে তোলার যোগ্যতা— যে যোগ্যতায় জন্ম নিয়েছিল কৃশানু। বাটা সু কোম্পানির কর্মী হোস্টেলের একঘরের বাসিন্দা হরিপ্রসাদ ভৌমিক ও মদন দাস (আমি)। সাহিত্যপ্রেমী দুই যুবকের বন্ধুত্ব হয়েছিল সহজেই। সন্ধ্যাবেলা ফ্যাক্টরীর পিছনে গঙ্গার ধারে বসে দুই যুবকের ছিল লাগামছাড়া সাহিত্য চিন্তা। হরিপ্রসাদের কল্পনা তো বিশাল নদী আর আকাশের মতো সুদূর প্রসারী। এমনই এক সন্ধ্যায় হরিপ্রসাদ বলল— লেখা নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে আর ভালো লাগে না, আমরা নিজেরাই একটা পত্রিকা করব, মন ভরে লিখব। যেমনই ভাবা তেমনই কল্পনা ছুটল তার বিদ্যুৎ গতিতে—'পত্রিকা অফিস করতে হবে, অবশ্যই কলকাতার কলেজস্ট্রীট এলাকায়। টেলিফোন তো থাকবেই, সম্পাদকের আলাদা চেম্বার। আমার একটা ধারাবাহিক উপন্যাস দিয়ে শুরু করব' ইত্যাদি ইত্যাদি।

—আমার কিন্তু দুর্গাপূজা আর কালীপূজার সুভ্যেনীর সম্পাদনার অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু জানা নেই। একটু প্রুফ্ দেখতে পারি—এই পর্যন্ত।

—আরে আমারই কি অভিজ্ঞতা আছে নাকি—হরিপ্রসাদ বলল। মুঠো করে সিগারেটে টান দিয়ে হা হা হাসি।

হরিপ্রসাদের জীবনের কথা—যা সে গল্প করার সময় বলেছে কিছু কিছু—তা এরকম—দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালি থেকে পালিয়ে আসা পরিবার। বাবা মারা গেছেন

স্ট্রোকে—মাত্র চল্লিশেরও কম বয়সে। দাদা বাটা সু-কোম্পানীর সাধারণ কর্মী—একদিন সকালে কাজে যাওয়ার সময় ফ্যাক্টরী গেটের কাছেই স্ট্রোক্ হয়ে পড়ে মারা যান—ওই চল্লিশেরই কম বয়সে। হরিপ্রসাদ তখন বাংলা বর্ডারের কাছে কোথায় এক সাধারণ প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করে কোনো রকমে দিন গুজরান করছে। তখন তার দাদার কয়েকজন বন্ধু ইউনিয়ন নেতাদের ধরে করে হরিপ্রসাদকে এনে বাটা কোম্পানীর প্রাইমারি স্কুলে চাকুরির ব্যবস্থা করেছেন—বিধবা বৌদি ও ভাইপো ভাইঝিকে ভেসে যাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য। দাদা থাকতেন বাটানগরের বাইরে এক ভাড়া ঘরে; তাই হরিপ্রসাদের থাকার ব্যবস্থা হলো কর্মী হোস্টেলে। সংসার না করেও সংসারের জোয়াল কাঁধে তুলে নিতে হলো।

কিন্তু তার চোখে সাহিত্যিক হবার অন্তহীন স্বপ্ন! অত্যন্ত আবেগ প্রবণ, কিছুটা খেয়ালী হরিপ্রসাদ। গঙ্গার ধারে বসা— সে যেন সারাদিনের পরিশ্রমের শেষে এক সুখময় স্বপ্নের জগতে প্রবেশ। পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে! কি উত্তেজনা, কি উন্মাদনা! অদ্ভুত দক্ষতায় কিছুদিনের মধ্যেই সে নিয়ে এল কয়েকজন বন্ধু ও পরিচিত মানুষকে—কৃশানুর মানব সম্পদ! এ সম্পর্কে কৃশানুর ভূতপূর্ব সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় দশম বর্ষপূর্তি সংখ্যায় কৃশানুর কথা লিখেছিলেন। সেই লেখাটির অংশ-বিশেষ এই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হলো। শুরু থেকে দশ বছর পথ চলার কথা তাঁর দরদী কলমে সুন্দরভাবে ধরা আছে।

সব কুঁড়ি ফুল হয়ে ফোটে না, সব ফুল ফল হয় না। হরিপ্রসাদের স্বপ্নও ফলবতী হয়নি। রেজিস্ট্রেশনের মাত্র এক বছর পরে বজ্রপাত। হরিপ্রসাদের মৃত্যু। তার বাবা ও দাদার মতোই হরিপ্রসাদের স্ট্রোক এবং মৃত্যু। সম্ভবত ঃ 'হেরিডিটি'।

সকলকে এনে একসূত্রে গেঁথে দিয়ে চলে যাওয়াই ছিল যেন তার কর্ম। সেই কর্ম শেষ করে চলে গেল। হোস্টেলের ঘরে মারা যাওয়ার জন্য নিয়মমাফিক শবব্যবচ্ছেদ হয়েছিল। কাঁটাপুকুর থেকে কেওড়াতলা মহাশ্মশান। সকল সদস্যদের শোকার্ত নীরব উপস্থিতি। এরাই তো তার পরমাত্মীয়। খুলে গেল ইলেকট্রিক চুল্লির মুখ। ভিতরে গনগনে আগুনের কি রূপ! তার মানসপুত্র-কৃশানু—এক টুকরো আগুন—আমাদের হাতে সঁপে দিয়ে হরিপ্রসাদ চলে গেল আগুনের স্রোতে... বোধহয় তার আয়ুর সবটুকু সে দিয়ে গেছে কৃশানুকে।

আমরা সকলে সেদিন ভেবেছিলাম অন্তত হরিপ্রসাদের স্মৃতির জন্যও কৃশানুকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

কৃশানুর মানব সম্পদ দীনেশচন্দ্র সিংহ। দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালী থেকে চলে আসা আরেক পরিবারের মানুষ। সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ বয়স। স্কুলের গণ্ডী পার হননি। এখানে কি কঠিন জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যে লেখাপড়া করেছেন সে এক ইতিহাস। তারপর চাকরী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ করণিক। সেই পদে চাকুরী করেও কিভাবে ডক্টরেট করেছেন সেও এক ইতিহাস। খদ্দরের পাঞ্জাবী আর ধুতি পরা ছোট খাট মানুষটি

অসাধারণ গবেষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সাধারণ পদ থেকে ধীরে ধীরে ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদ পর্যন্ত দীর্ঘ পথ চলা—সেও এক ইতিহাস।

শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্ধদিবস ছুটি। ছুটির পর দীনেশদার অফিসঘর হয়ে উঠত কৃশানুর পরিচালন সমিতির আলোচনা স্থল। এভাবেই সকলের মধ্যমণি হয়ে সকলকে সঙ্গে নিয়ে সমবেত প্রচেষ্টায়, শনিবারের আরেকটি আড্ডাস্থল ছিল ৩০/১এ, কলেজ রো, শান্তিবাবুর প্রকাশন 'লিপিকা' যে ঠিকানা কৃশানুরও ঠিকানা তাঁরই বদান্যতায়। শনিবার দুপুরের পর দীনেশদা চলে আসতেন, একে একে অনেকে এসে জুটতেন সন্ধ্যা পর্যন্ত চলত আড্ডা! এভাবেই তিনি অতিক্রম করেছেন কৃশানুর রজতজয়ন্তী এবং এভাবে ছেচল্লিশতম বর্ষ। আজ পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে তাঁর অনুপস্থিতি বড় ব্যথা দেয়। আর মাত্র কয়েকটি বছর যদি আমাদের সঙ্গে থাকতেন! ২০১৪ সালের ১৬ জুন তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। মৃত্যুর কদিন আগে হাসপাতালের শয্যায় শুয়েও কৃশানু সম্বন্ধে দু-একটি কথা বললেন। তারপর সেই ম্লান বিকালে দুজনে মুখোমুখি বসে চুপচাপ, ঘরে আর কেউ নেই। একসময় মৃদু গলায় বললেন— হাতটা দিন। দুজনে হাতে হাত রেখে চুপচাপ কেটে গেল কতক্ষণ। সেই আমার সঙ্গে তাঁর শেষ কথা।

হরিপ্রসাদের মৃত্যু ছিল এক বড় আঘাত, দীনেশদার মৃত্যু আরও বড় আঘাত।

২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী কৃশানু পত্রিকার সম্পাদক রূপে তাঁকে সম্মানিত করে। এটি তাঁর জীবনে তথা কৃশানুর জীবনে একটি বড় স্বীকৃতি।

আমাদের আরেকজন সহযোগীর কথা এখানে অবশ্যই লেখা প্রয়োজন, তিনি প্রভাস ভদ্র। দীনেশচন্দ্র সিংহ তাঁর কৃশানু'র কথায় লিখেছেন—

'এমন সময় গেছে যে কৃশানু মাত্র চারটি লোকের ওপর নির্ভর করে আত্মরক্ষা করছিল এবং বাটানগরে 'বিচিত্রা' নামক সৌখিন দ্রব্যের দোকানটিই কৃশানু'র হেড কোয়ার্টার হয়ে উঠেছিল।'

এই 'বিচিত্রা' হলো প্রভাস ভদ্র'র দোকান আর চারজন লোক হলেন প্রভাস ভদ্র, দীনেশচন্দ্র সিংহ, মদন দাস ও রত্নেশ্বর বর্মন। প্রায় দিনই সন্ধ্যাবেলা আমরা মিলিত হতাম ওখানে। আড্ডা এবং কৃশানু'র আলোচনার মাঝে খরিদ্দার এলে প্রভাস বিরক্ত হতো। খদ্দের যেন না এলেই ভালো। প্রভাস সম্পর্কে আরও কথা দীনেশদা 'কৃশানু'র কথা'য় লিখেছেন। প্রভাস ভদ্র কৃশানু থেকে উঠে আসা এক বলিষ্ঠ গল্পকার।

কৃশানু থেকে উঠে আসা আরেক বলিষ্ঠ গল্পকার রত্নেশ্বর বর্মন। দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালি থেকে চলে আসা আরেক পরিবারের সন্তান। দীর্ঘ জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যিনি নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন শক্ত মাটিতে। তিনিও কৃশানুর শুরু থেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। বছর দুয়েক হলো তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন পরলোকে।

বস্তুত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের জীবনে কৃশানু অনেক মৃত্যুর সাক্ষী। যাঁরা কৃশানুকে লালন পালন করেছেন পরম স্নেহ মমতায়।

চাকুরী থেকে অবসর নেওয়ার পর থেকে মূলত বাটানগরের ঘেরাটোপেই আটকে পড়েন দীনেশদা। কৃশানু বছরে একটি মাত্র সংখ্যায় এসে দাঁড়ায়। পূজা সংখ্যা। ওই সময় মাস দুই-আড়াই দীনেশদার সঙ্গে মুখোমুখি হতাম। লেখা নির্বাচন, প্রেসে যাওয়া প্রুফ দেখা এবং কিছু আর্থিক সহায়তা কৃশানুকে—এভাবেই চলেছে। এসময় বাটানগরের রবিবাসর গোষ্ঠী তাঁকে কৃশানু প্রকাশে সর্বতোভাবে সহযোগীতা করেন। কিন্তু তাঁরাও সকলে বৃদ্ধ হয়েছেন।

কৃশানুর রেজিস্ট্রিকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী একজন মাত্র জীবিত—আমি। আমিও বৃদ্ধ বয়সে উপনীত। কিন্তু কৃশানুকে আরও দীর্ঘজীবি করতে হলে চাই নবীন মানুষদের। পরবর্তী প্রজন্মকে তুলে আনতে না পারলে কৃশানু শেষ হয়ে যাবে।

এটা Net-এর যুগ। এখন হাতের মুঠোয় পৃথিবী। কৃশানুকে সারা পৃথিবীর বাঙালিদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি E-mail ঠিকানায় যুক্ত করেছি, Face Book-এ যুক্ত করেছি। এবং কৃশানুর সংখ্যাগুলিকে E-Book করার ব্যবস্থা করেছি। এর মাধ্যমে আমি কৃশানুর থেকে উঠে আসা কবি ও সাহিত্যিকদের গ্রন্থ E-Book করে চলেছি। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে বসে বাঙালিরা এখন Net-এর মাধ্যমে পড়তে পারবেন। এ ব্যাপারে আমি অভূতপূর্ব সাড়া পাচ্ছি। Face-Book এবং E-Mail-এর মাধ্যমে এত মানুষ যে কৃশানুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভাবা যায় না। পাশের বাংলাদেশ থেকে শুরু করে। পৃথিবীর অপর গোলার্ধ থেকেও কবিতা পেয়েছি কবিতা সংখ্যার জন্য।

এখন পরবর্তী প্রজন্মের সন্ধানে আছি যাঁদের হাতে কৃশানু রক্ষিত থাকবে এবং শতায়ু হয়েও এগিয়ে চলবে।

কৃশানুর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষপূর্তি কবিতা সংখ্যা সম্পর্কে :

বিগত পঞ্চাশ বছরে কৃশানুতে কয়েক হাজার কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। মূলত নবীন কবিদের কবিতা। তবে প্রতি সংখ্যাতেই কবিতাগুচ্ছের প্রথমে কয়েকজন স্বনামধন্য কবির কবিতা রাখা হয়েছে অলঙ্কারের মতো যে কবিতা নবীন কবিদের কবিতা রচনা সম্পর্কে কিছু আলো দেবে। সেই সকল স্বনামধন্য কবিদের কিছু কবিতা এই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হলো যে কবিতাগুলি এই সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করবে এবং পাঠকেরাও তৃপ্তি পাবেন।

কৃশানুর পাতায় প্রকাশিত স্বনামধন্য কবিদের কবিতাগুলি সংগ্রহ করতেন শান্ত রায়। সেই কৈশোরোত্তীর্ণ বয়স থেকে তিনি কৃশানুর কবিতা বিভাগকে সমৃদ্ধ করেছেন, নিজেও সমৃদ্ধ হয়েছেন। আজ কৃশানুর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বরিষ্ঠ নাগরিক। কৃশানুর দীর্ঘদিনের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সিংহ তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন।

নবীন কবিদের অজস্র কবিতা দিয়ে এই কবিতা সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করা হলো, আশা করি সাহিত্যপ্রেমী মানুষেরা কবিতা পড়ে তৃপ্ত হবেন।

মুদ্রিত আকারে প্রকাশের পাশাপাশি এই সংখ্যা ই-বই আকারেও প্রকাশিত হলো। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে বসে পড়তে পারবেন সাহিত্যপ্রিয় মানুষ। ভবিষ্যতে কৃশানুর অন্যান্য সংখ্যাও মুদ্রিত ও ই-বই হবে।

—মদন দাস

পোড়া হৃদয়ের গন্ধ

বিজয়

কবি বিজয় এর

কাব্যগ্রন্থ

পোড়া হৃদয়ের গন্ধ

প্রকাশক :

সন্দাক্রান্তা

কলেজ রো, কলকাতা – ৯

বিনিময় - ১০০ টাকা

যুগকণ্ঠে কে তুমি

বিজয়

যুগ কণ্ঠে

কে তুমি

প্রকাশক :

পত্রলেখা

কলেজ রো,

কলকাতা

বিনিময় : ৮০ টাকা

শিল্পী : রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। (পুনর্মুদ্রিত)

সূচিপত্র

পুনর্মুদ্রিত কবিতাবলী

কৃশানুতে প্রকাশিত পঞ্চাশ বছরের কবিতা থেকে নির্বাচিত।

শোনো

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আকাশের নীল প্রশান্তি ওরা ভাঙে
বোমারু বিমানে স্পর্ধিত হুঙ্কারে,
মাটির শ্যামল স্নেহ মুছে দেয় ওরা
জীবন দহন বিষে,
নারী ও শিশুর
বোবা বিহ্বল নিরুপায় যন্ত্রণা
ওদের হত্যা-মহোৎসবের
উপাদেয় উপচার।
মূঢ় পিশাচেরা জানে না,
তাজা মানুষের রক্ত যে নয়
'ডেরিক'-এ শোষিত
পাতাল-বাহিনী ক্লেদ,
শুধু পাতকের দূষিত ছোঁয়াচ ছড়াবার।

আগামী কালের সব মানুষের জন্যে
নিজেদের যারা বলি দিয়ে যায়
অকাতরে হাসিমুখে,
তাদের প্রতিটি রক্তবিন্দু
পারমাণবিক তেজে
সংহত হয়ে মুহূর্ত গোনে
প্রলয় বিস্ফোরণের।
ডেরিক-বাহন দম্ভের শোনো,
গর্জন নয়
হতাশ নাভিশ্বাস!

স্মৃতি

সুশীল রায়

আমাদের মধ্যে ছিল অফুরন্ত স্মৃতির গুঞ্জন
সর্ব অভিলাষ দিয়ে কী করে মন্থন
করি সে সমুদ্র—সেই চিন্তায় বিভোর।
আমাদের সব কথা সবই প্রত্যহ'র—
সেসব আগামীকল্য কী হবে কী হবে
গত কল্যকার চিন্তা দিয়ে সেই বাসী মহোৎসবে
অযথা বাজাব বাঁশি? স্মৃতির মন্থন
চায় না এ মন।

সমুদ্র সেই সমুদ্রও (জ্যুসেপ্পে উংগারেত্তি)

বিষ্ণু দে

নেই আর মৃদু মর্মরিত নেই সেই গর্জমান সমুদ্র
সেই সমুদ্র

সব স্বপ্ন নিংড়ানো শুভ্রক্ষার প্রান্তর সমুদ্র
সেই সমুদ্র
যেন দুঃখের আঘাতে স্ফীত সমুদ্র
সেই সমুদ্র
উদাসীন মেঘের পাঁতিতে দোল খায় সমুদ্র
সেই সমুদ্র
করুণ ধোঁয়ায় ওঠে শয্যা থেকে সমুদ্র
সেই সমুদ্র
মনে হয় মরে গেছে সমুদ্র
সেই সমুদ্র।

মহিনের ঘোড়া

ফণিভূষণ আচার্য

তুমি কি বারান্দা দিয়ে বারান্দায় চলে যাও রোজ সন্ধেবেলা
কার হাত ধরো কোন পুরুষের হাতে গুঁজে দাও
প্রথম প্রেমের অসমাপ্ত চিঠি
কার বুকে মুখ রেখে কেঁদেছিল
তোমার গোলাপ-ভীরু কিশোরী বয়স
সেখানে কি ঘাসে মুখ দিয়ে সূর্যের উজ্জ্বল স্বাস্থ্য
পান করে মহিনের দুরন্ত ঘোড়ারা

তুমি কি বারান্দা দিয়ে বারান্দায় চলে যাও রোজ সন্ধেবেলা
চাঁপার গন্ধের মতো সিঁড়ি দিয়ে সিঁড়ি ঘুরে
মিশে যাও দুরন্ত জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নার ওপারে
গোপন সুড়ঙ্গ পথে দেখা যায় চাঁদের কলোনি
চাঁদের শহরতলি ছায়াবান ঈশ্বরের ঘর
ওখানে কি অর্জুন গাছের নিচে বাঁধা আছে
মৃত সব মহিনের ঘোড়া

যন্ত্রণা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

মাথার মধ্যে দারুণ এক যন্ত্রণা,
অথচ এরকম যন্ত্রণা আমার কখনো ছিল না।
বুকের মধ্যে কোথাও
শোণিত প্রবাহের ভেতর
ছড়িয়ে পড়ছে এই যন্ত্রণা,
আর সঙ্গে সঙ্গে যেন নিমেষেই
আমার চোখের সামনে সমগ্র নিসর্গের ভেতর
ঝাপসা হয়ে আসছে দৃশ্যগুলো,
মনে হয়
আর একটু বাদেই সব অন্ধকার হয়ে যাবে।

না আমি মরছি না, অন্ধও নই;
আমার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্নায়ুগুলোও
মোটামুটি সুস্থ;
আসলে আমার শরীরের রক্ত চলাচলে
এখন ছড়িয়ে আছে দারুণ কাপুরুষতা,
সময়ের চাকায় লাগছে নিত্য নতুন ঘটনার রক্তের দাগ,
আমি নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছি...
আর ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেহে দুর্বিসহ যন্ত্রণা!

স্বগত

হরপ্রসাদ মিত্র

জানলার বাহিরে বর্ষা, ভেতরে কলমে
নিষ্প্রাণ শব্দেরা বটে আসে দলে দলে,
সেসব ছাপানো কিন্তু দ্বিবিধ নিধন—
নিজেকে এবং সুধী পাঠকেরও মন।

মতি বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের মূর্চ্ছা বা জড়তা;
পাড়ায় সন্ত্রাস; দেশে নেই মনুষ্যতা;
হৃদয় দরিদ্র, তাই দেখি হিন্দি ছবি;
যে-কোনো হুজুকে হই হুজুকের কবি।

দুঃখের সমুদ্র ভাঙ্গে জীবনের তট।
বংশ পরম্পরাক্রমে আমরা কি নট?

মানবতা, তুমি

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মানবতা, বিংশ শতাব্দীর শেষ আলো!
যখন চারদিকে ছিন্নভিন্ন আমাদের গান

যখন বিজ্ঞান পারমাণবিক পশুর স্পর্ধায়
তেজীমন্দী বাজারের হৈ হৈ; রাজনীতির সমাজ কল্যাণ
শুধু বেশ্যাবাড়ি থেকে মাটি এনে প্রতিমার চক্ষুদান—
তাতে লাগে না প্রেমের হাওয়া

তখন তুমিই একা ভূতে পাওয়া সভ্যতার
জিঘাংসার মুখোমুখি দাঁড়াও! তুমি নিষ্পাপ নচিকেতার মতো
যমকেও প্রশ্ন করো ঃ 'কেন এত লোভ, এত হিংসা,
এত মৃত্যু?'

জেগে থাকা

মণীন্দ্র রায়

শান্তি পাওয়াটাই বড় কথা নয়,
আসল ব্যাপার মনে হচ্ছে—জেগে থাকা।
না, তার জন্যে হাতড়ে বেড়াবার দরকার নেই;
যদি পারো, প্রেমে পড়ো—
যে মেয়ে নিপুণ ভাস্করের আবেগে
একটা দ্বিমাত্রিক রেখায় আঁকা স্কেচের মতো
তোমার ভেতর থেকে
তীক্ষ্ণ বিস্ময় আর সংশয়ের ছেনি দিয়ে
কুঁদে বার করবে আলোকিত অবয়ব;
কিম্বা দাঁড়াও গিয়ে রাত্রির অন্ধকারে—
দেখবে, ছুটন্ত জিরাফের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে-পড়া সিংহের মতো
অব্যর্থ লক্ষ্যে বিঁধবে তোমাকে
সারাদিনের নিষ্ফল তুচ্ছতার যন্ত্রণা;
আর, ভয়াবহ একখানি-বিস্ফোরণের আকস্মিকতায়
মুহূর্তেই তোমার মধ্যে জ্বলে উঠবে
চেতনার টানেলে টানেলে ছড়িয়ে পড়া
জেগে থাকার আগুন।।

পৌষের শেষ রাতে

আবু বকর সিদ্দিক

হিমবাহ থেমে থেমে নেমে আসে
বঙ্গভূমি জনপদ নির্জীব প্রান্তর ঘাসে।
পাণ্ডুর চাঁদের কাঁধ সেই ঘাসে
সন্ধ্যার নিথর শব সযত্নে নামিয়ে রাখে।

হাওয়ার সাম্পানে চড়ে
বিদেহিনী ফিস ফিস কারা কথা কয়, ভীড় করে!
ভয়ের শীতল নীলে পাতাগুলি নুয়ে গেল যেন।
ওদের কপোল বেয়ে শীত-জ্বর-ঘাম নেমে এলো
শিশিরের বেশে।

তারপর জরা মৃত্যু হিম হাত
মিলহীন রাত
সবগুলি জোড়া এক কলি সুর জন্ম নিল;
চোখের পাতার তীরে পল্লবেরা ডানা মেলে দিল।
কী আশ্চর্য, অন্ধ গলি, ঠাণ্ডা ঘর, নির্জন আকাশ,
বাসি উঠোনের বুকে চন্দ্রহাস!

ইলিশের বরফ-পিঠের মত চকচকে নিশীথের দাঁত
জ্যোছনা, এমন করে বাঁচো তুমি পৌষালী বাংলার
তুহিন-রাত্রিতে!

সে কিছু দুর্বল, ভালো

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মানুষের ভিতরের রক্ত তাকে পাগল করেছে
দাঁড়িয়ে রয়েছে এসে, অন্ধকারে, গলির আঁধারে—
হাতে খরশান জিহ্বা ইস্পাতের, কঠিন দাঁতের
তাতে কিছু সমাপ্তির চিহ্ন এসে ধরা দিতে চায়!

আমিও মানুষ, হাতে কিছু নেই—করতলে রেখা
আছে হিজিবিজি ভাগ্য, উড়ে যায়, উড়ে-পুড়ে যায়
কিন্তু, তা কখনো ছুটে মানুষকে আঘাত করে না—
সে কিছু দুর্বল, ভালো, কিছুটা মানুষে মায়াবাদী।

ছায়া ও বিচ্ছিন্ন অংশের সঙ্গে

দাউদ হায়দার

কাল সারারাত আমার কোন ঘুম হয়নি। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে
নিষ্পত্র গাছ যেমন একা এবং অসহায় দাঁড়িয়ে থাকে; প্রবল
হাওয়ায় আন্দোলিত হয়; —কাল সারারাত ঠিক তেমনি
আমি অনিদ্রার প্রহারে দুলছিলাম।

এইভাবে বহু রাত আমাকে জেগে থাকতে হয়। আমার ঘরময়
তখন বেহালার করুণ ক্রন্দনের মতো একটি অসুখী নিঃশ্বাস ক্রমাগত
বাজছিল। —যেন বহুদূর থেকে কোন রোদনধ্বনি ভেসে আসছে।

—আমি সেই রোদনধ্বনির ভিতরে আমারই একটি অংশকে; গতদিনের
রচিত কোন অসমাপ্ত কবিতার শেষ পংক্তির মতো
যন্ত্রণায় বিভাজিত হতে দেখছিলাম!

'তোমার প্রেম ছিল বাবুইপাখির বাসার মতো
ঘনবদ্ধ ও শৈল্পিক'—যেন কেউ বলে গেল, আর ঠিক তক্ষুনি
ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় আমারই আরেকটি বিচ্ছিন্ন অংশ!

সারারাত এইভাবে আমি ছায়া ও বিচ্ছিন্ন অংশের সঙ্গে খেলতে
খেলতে নিজেকে আবিষ্কার করি ঃ আমার ভিতর কেউ আমারই মতো
একজন অবিরল ধারায় কাঁদছেন!

বাংলা বাংলা বাংলা

তরুণ সান্যাল

মুক্তি ছিল হাতের মুঠোয় ফুলের কুঁড়ি
বুকের ওমে ফুটিয়ে তোলা লাল আগুনে
নদীর ঢেউয়ে চমক তোলে রেশমি চুড়ি
আরেক বাংলা আলতা পরছে তপ্ত খুনে

এমনি ভাবে লক্ষ বাহু উজাড় করে
জীবন দিচ্ছে প্রাণের দুঃখ আঁজলা ভরে

আয় রে জোয়ান আয় চলে আয় এ গৌরবে
সপ্ত কোটি ঐ বাঙালি উচ্চ শিরে
চার কোটি রই সঙ্গী, এবার মুক্তি হবে
মুগ্ধ মায়ের শ্যামল সোনার অঙ্গ ঘিরে।

একুশে ফেব্রুয়ারি

আলাউদ্দিন আল আজাদ

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো
চারকোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো। যে-ভিত কখনো কোনো রাজন্য
পারেনি ভাঙতে
হীরার মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার
খুরের ঝটিকা ধূলায় চূর্ণ যে পদপ্রান্তে
যারা বুনি ধান
গুণ টানি, আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই
সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য।
ইটের মিনার
ভেঙেছে ভাঙুক। ভয় কি বন্ধু, দেখ একবার আমরা জাগরী
চারকোটি পরিবার।
এ-কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,
শিহরে যাহার ওঠে না কান্না, ঝরে না অশ্রু?
হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহসা বরং
সকল বেদনা হয়ে ওঠে এক পতাকার রং
এ কোন মৃত্যু: কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,
বিরহে যেখানে নেই হাহাকার? কেবল সেতার
হয় প্রপাতের মহনীয় ধারা, অনেক কথার
পদাতিক ঋতু কলমেরে দেয় কবিতার কাল?
ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক। একটি মিনার গড়েছি আমরা
চারকোটি কারিগর
বেহালার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণলেখায়।
পলাশের আর
রামধনুকের গভীর চোখের তারায় তারায়
দ্বীপ হয়ে ভাসে যাদের জীবন, যুগে যুগে সেই
শহীদের নাম
এঁকেছি প্রেমের ফেনিল শিলায়, তোমাদের নামে।
তাই আমাদের
হাজার মুঠির বজ্রশিখরে সূর্যের মতো জ্বলে শুধু এক
শপথের ভাস্কর।

তার ইচ্ছার ইতিবৃত্ত

ফজল শাহাবুদ্দীন

প্রাণের গভীরে যার প্রথম রিপুর জ্বালা সেই অষ্টাদশী
একদা দাঁড়ালো এসে নির্জন দর্পণে, মুখে হাসি
ক্লান্ত চোখ, অলস দু'বাহু দিয়ে নগ্ন তার বুকের উপর
ছড়ালো চুলের গ্রন্থি; তারপর
কেমন গানের মত গুন্ গুন্ করে ভাবলো সে, হায়
যে আমাকে স্বপ্ন দেবে হৃদয় ভরাবে যে পুরুষ
সে কোথায়?

সোনালী বসন্ত তার এমনি কি কেটে যাবে, রাত্রি হবে নাকি গাঢ়
স্পর্শময় বিজন প্রহরে; এবং বিষণ্ণ কারো
গোপন নামের মন্ত্র আষাঢ়ে বৃষ্টির মত রক্তে তার
হবে নাকি নিঃসঙ্গ সেতার!
রাত্রি হলো আরো
এই মত ভেবে ভেবে সেই নারী নিজেরে শুধালো
কখন প্রদীপে তার হাওয়া লেগে নিভে যাবে আলো
তারপরে
দু'জনে বিলুপ্ত হবে অন্ধকার স্বপ্নের ভিতরে।

ক্রমে আরো বেড়ে গেলে রাত সেই নারী
মোহিনী শরীর থেকে নামালো নিঃশব্দে তার অপরূপ শাড়ি,
তাকালো আবার ফিরে
নির্জন দর্পণে ধীরে ধীরে
গ্রীবায় তুললো ঢেউ, আলোটা নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে ভাবলো সে
ভালোবেসে
ওই পুরোনো অলিন্দে, প্রীত নরম হাওয়ায়
যে আমাকে ক্লান্তি দেবে হৃদয় ভরাবে যে পুরুষ
সে কোথায়?

আমার বর্তমান

আলোক সরকার

একটা গাছ ছিলো নদীর কিনার ঘেঁষে, অনেকদিন হলো
সেই গাছ আর নেই। ঘুমিয়ে পড়বার আগে
আমি ভাবি সেই গাছ—একটা ডাল বাঁকা ঝুঁকে পড়েছে জলের ভিতর।
এবার বৈশাখ দিনে কৃষ্ণচূড়া হয়েছে অনেক উচ্ছ্বসিত জারুল।
আমার সারাদিন কৃষ্ণচূড়ার বর্ণের ভিতর, আমার বর্তমান
উচ্ছ্বসিত জারুলের ভিতর।
যা কিছু বর্তমান তাই প্রখর উচ্চারণ তাই তো বৈশাখদিন
আর সবই তো হেমন্ত ভিজে মাটির পথে শিউলি-ঝরানো একাকী।
শিউলি-ঝরানো একাকী কত নিরুত্তাপ সম্মোহন! প্রতিটি ঘুমের আগে
বাঁকা একটি ডাল ঝুঁকে পড়েছে জলের ভিতর।
বাঁকা একটি ডাল আর আমার বর্তমান ঘুমিয়ে পড়বার আগে
উন্মীলিত কৃষ্ণচূড়া উচ্ছ্বসিত জারুল আর জলের ভিতর
স্বচ্ছ নির্মেঘ শূন্যতা গগনভরা উচ্চারণ।
এইরকম অভিজ্ঞতা কোথাও নয় তরঙ্গ। প্রতিটি ঘুমের আগে
জ্বলে আমার বর্তমান কৃষ্ণচূড়ার প্রখরতা আলুলায়িত জারুল
আর জলের ভিতর বাঁকা একটি ডাল।

মুখ

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

আরো একটি রেখা বাকি আছে।
বাঁকা ঠোঁট যথাযথ, ঈষৎ মন্থর দুটি চোখ,
আনাচে-কানাচে কিছু কাটাকাটি খেলা
এই মাত্র ভেসে উঠলো
কিন্তু ঠিক সম্পূর্ণ হোল না।
আরো একটি রেখা যেন কোথাও অস্পষ্ট থেকে গেল।

আনো
ছুঁচের ফোঁড়ের মতো সে রঙিন সুতোটি চমকানো
আলো হোক,
হাসি হোক প্রকৃত আনন্দ।
আরো একটি রেখা যদি ও-মুখে জাগ্রত হতে দাও
মন্থর চোখের খুব অপ্রীত হবে না।

মনীশ ঘটক

রাণা বসু

সাত সমুদ্র, দশ দিগন্তে ভালোবাসার আকালের মধ্যে
দেহে ও প্রকাশে অফুরান প্রাণ-প্রাচুর্য ছিল যাঁর ঐশ্বর্য
দু বাহু বাড়িয়ে যিনি অপরিচিতকে মমতায় আপন করে নিতে পারতেন
তিনি মনীশ ঘটক।
উন্নত মস্তক, চির যুবক মনীশ ঘটকও
অবশেষে রাজার মতো চলে গেলেন।

যার কবিতায় ছিল শব্দের সূর্যোদয়
অন্ধকার পথে যিনি ছিলেন বহু জনের চলার সঙ্গী
অনিবার্য সকালে তাঁর সৃষ্ট পদগুলি
আমরা স্তবের মতোই আবৃত্তি করব।
পুঞ্জ পুঞ্জ নীরবতায়
অমল স্মৃতিগুলি জ্যোৎস্না আলোয় বিভোর হোক।

দ্বিপদীমালা

শঙ্খ ঘোষ

লক্ষ্মীছাড়া দুঃখ এলো আরো একবার এ-জীবনে
বড়োই বিহ্বল আছি তোমাদের কাণ্ডকারখানায়

*

সমস্ত ধন্দের থেকে মীমাংসা পেয়েছে বাচ্চা ছেলে
গোঁফদাড়ি উঠেছে বটে, বাল্যশিক্ষা এখনো মেটেনি।

*

চমৎকার, বাপধন, জ্ঞানগম্যি বিশল্যকরণী
তুমি যা বুঝেছ সেটা অন্য কে-বা বোঝে বঙ্গভূমে।

*

মুখ থুবড়ে পড়েছে গাছ শালতালতমালহিন্তাল
গুঁড়ির উপরে আজ মজাদার নাচ হবে, এসো।

*

কাঁটাঝোপ জমে জমে কতদূর ছেয়ে গেছে দেখো
এমন ঈশ্বরতলী শরীর নির্বোধ হয়ে আছে।

হৃদয় অব্দি যায়নি ছুরি

অমিতাভ দাশগুপ্ত

একটি খুনের প্রতিবাদের মিছিলে যে সবার আগে ছিল,
সে মিছিলের সবার আগে খুন হয়েছে।

হৃদয় অব্দি যায়নি ছুরি—থমকে আছে।
শোষণ-মুক্তি
স্বপ্ন এখন দুই চোখে স্থির জলের শুক্তি
অন্ত্যমিল-ও
মানায় না আর। এর কোনো কি অর্থ ছিল?

কোথায় বুকের একরোখা দুর্দান্ত ঝিলাম,
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহস বাড়ুক, চেয়েছিলাম,
হা-হুতাশের বালির ’পরে বালিয়াড়ি
নয় তো ভয়ের স্যাংচুয়ারি—
ন্যাংটো ছবি দুলছে ঘরে ফ্রেমের কাচে;
ঐখানে, গজবিশেক দূরে
দুর্বোঘাসে—
হৃদয় অব্দি যায়নি ছুরি। থমকে আছে।

স্থির অস্থির

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

দীর্ঘদূরে পতংগের মতো গুঞ্জরণ—
কার ট্রেন আসে?
এখন চঞ্চল হাওয়া খেলা করে আকাশে আকাশে
রণন্, ঝনন্।

কারা আসে, কারা বাসা বাঁধে, কারা যায়—
নিগূঢ় চলাফেরা,
আমার বাগান আছে একান্ত আমার, ছায়া-ঘেরা,
—আমাকে বাঁচায়।

তবু শব্দ শোনা যায়। দীর্ঘশ্বাস! কে এসেছে কাছে?
তবে কি আমাকে ওরা টেনে নিতে চায় ভিড়ে, আনাচে-কানাচে?

নিজের আড়ালে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে
সে খোঁজে ভ্রমর কিংবা
দিগন্তের মেঘের সংসার
আবার বিরক্ত হয়
কতকাল দেখে না আকাশ
কতকাল নদী বা ঝর্ণায় আর
দেখে না নিজের মুখ
সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে।

নারীর রূপের ফাঁদে
বার বার হয়েছে কাঙাল
যেমন বাতাসে থাকে সুগন্ধের ঋণ
অযুত বর্ষের স্মৃতি আবার কখন মুছে যায়
অসম্ভব অভিমানে খুন করে পরমা নারীকে
অথচ সে অস্ত্র তোলে নিজেরই বুকের দিকে
প্রকৃতিকে চিনেও চেনে না
সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে।

পরস্পর

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

কোথাও কেউ নেই, একা সুতো ছেড়ে চলেছে বালক,
এক সুঠাম কাগজ তাকে ভোর থেকেই আকাশে এনেছে ডেকে।
মেঘে মেঘে চিত্রল শূন্যতা, কেউ না বুঝুক বালক বুঝেছে
ঘুড়ির আর মাটিতে ফেরার ইচ্ছে নেই;
তবু সে চেয়েই আছে যদি পাশে আসে কোনো নতুন দোসর!
তবে হুলুস্থুল পড়ে যাবে নীলের সমাজে, ত্রস্ত হবে পাখি;
রঙিন কাগজ তারা পরস্পরকে আক্রমণ করবে; ভালোবাসবে কাঁদবে
যতক্ষণ না অন্তত একজন
নেমে এসে কিশোরের দিবাস্বপ্নে মুখ থুবড়ে পড়ে।

তোমাকে না দেখার দুঃখ

তারাপদ রায়

বহুদিন হলো তোমার দেখা পাই না।
এ কথার মানে এই নয় যে,
তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে হয়,
বা তোমার কাছে আমার কিছু পাওনা রয়ে গেছে।

আসলে বহুদিন তোমার দেখা পাই না;
যেমন বহুদিন শিলাবৃষ্টি হয়নি,
যেমন বহুদিন ঝর্ণা দেখিনি,
বহুদিন কোনো নদীর স্রোতে সাঁতার কাটিনি।
অনেকটা সেইরকম,
বেদনা ও মমতা বোধহীন
তোমাকে না দেখার দুঃখ
সম্পর্ক ও যোগাযোগহীন তোমার স্মৃতি।

বহুদিন হলো তোমার দেখা পাই না।

এই বেল্লিক জন্তুটা

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

কে যেন বিছিয়ে দেয় মলিন চাদর ফুলের বাগানে
কে যেন টানছে ছড় বেহালায় বেহাগ বাজিয়ে।
ধান শুকোবার আগে বৃষ্টি নামে অঘ্রাণের শেষে,
কোনো গান আর দেখি থামে নাকো স'মে,
মাঝখানে ছেঁড়ে সুর, কড়ি ও কোমল একীভূত।
চতুর্দিকে হান হান খরশান অগ্নিবাণ ছোটে।
আসলে এসব মনে প্রতিভাত হয়, বস্তুত চতুর
বেরসিক জন্তু এক নৃত্য জোড়ে সৌহার্দ্য-মুদ্রায়
উপকারী বন্ধুর মতন। গৃহস্থের শ্যামল সংসারে
উন্মত্ত ভল্লুক এসে কেড়ে নেয় প্রাণের সুষমা।

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির এই বেল্লিক জন্তুটা
কুরে কুরে খেয়ে নেয় মধ্যবিত্ত অস্থিমেদমজ্জা।

হরিতকী বাগান তুমি বহুদূর

সুনীল বসু

হরিতকী বাগানের দিনগুলি বড়ো বিষময় ছিল
বহু ব্যর্থ কালক্ষয়
ওইখানে ছিল চিরকাল আমার ললাট-লিখন
সেই ঘুপ্‌চি কানা-ঘর, বাঁকা গলি, চিম্‌সে রোদ
সেই ভয়ঙ্কর অহঙ্কারী শ্যেনদৃষ্টি,
ঠাট্টাচ্ছলে পরস্পরে কূটতর্ক, বাগ-বিতণ্ডা
শাণিত ক্ষুরের মত ঈর্ষার-আগুন
হরিতকী বাগানের দিনগুলি
অপরের শ্বাসকষ্টে, ক্রুর দুঃখে,—
মৃত্যুর মতন ভাবলেশহীন নির্বিকার।
হরিতকী বাগানের দিনগুলি এখন উচ্ছিষ্টে শোধ হয়ে গেছে;
এখন দুঃস্বপ্ন-রাজ্য থেকে বহুদূর নির্বাসিত
গ্রামের সবুজ পথে
মখমলে-ঝলমল হীরার মতন
কালো-রাত্রির নক্ষত্রের বেগময় অন্ধকারে;
সেইখানে সারারাত ধরিত্রীর গুঞ্জিত মেসিন
এখন আল্‌মারির কাচে জোনাকির কুচি তারা
মধ্য রাতে স্নান-করা উদাসিনী খণ্ড চাঁদ
এখন বৃষ্টির পরে বাতাসের হাল্কা-আতর
অর্জুন-গাছের নীচে
বহুদূর তুমি হরিতকী বাগান

শিল্পী : নিখিল বিশ্বাস। (পুনর্মুদ্রিত)

একটি কবিতা

বিনয় মজুমদার

এখন আমার ঘরে তিনজন পুরুষ ও একটি রমণী
রমণীটি হেঁটে হেঁটে দূরে চলে গেল আর একটি পুরুষ
সেও চলে গেল এই ঘর থেকে, এ মুহূর্তে
আরো এক রমণী এসেছে

$f(x)+F(x)=O$

এখন আমরা শুধু দুজন রয়েছি ঘরে আমি আর শান্ত রায় শুধু
দূরে কোনো যন্ত্র যায় বা যন্ত্রবাহন যায় বলা ভালো ফলে
যন্ত্রের আওয়াজ আসে, আমার দরজাটির বাইরে বারান্দা দিয়ে গেল
দুইটি মানুষ আমি মাঝে মাঝে মানুষকে দেবতা বলেও ডেকে থাকি।

$f(x)=F(x)$

এইভাবে আজ এই রবিবারে প্রতিটি শব্দের দ্যোতনায়
চমৎকৃত হয় 'এইভাবে' মানে হয় 'এই' কথা 'ভাবে'
'আজ' মানে অজ থেকে জাত এক ছাগলবালক
'রবিবারে' মানে রবি 'রয়ে যাবি' 'বারে' মানে
মদের দোকানে

$f(x)=N=F(x)$

তাহলে মানেটি হল 'এক ছাগলবালক এই কথা ভাবে
রবি তুই রয়ে যাবি মদের দোকানে' আর মূল বাক্য ছিল
'এইভাবে আজ রবিবারে' কবিতাটি ফের পড়ে দেখ।

$f(x)=N$

$-F(x)=N$

এই কবিতাটি বেশ দীর্ঘ হয়ে গেল এই বর্তমানে
নরকণ্ঠ শুনি।

এ প্রকার নরদের নারীদেরও ঠোঁট নেড়ে বলা বাক্যগুলি
বিচিত্র মানের হয়। একবার আমি নিজে এক দর্জিকে
সহজে বলেছিলাম—'দোকান বন্ধই' করে বাড়িতে যাবেন
ফের খেয়ে দেয়ে এসে 'দোকান খুলবেন তো' মানে 'দো' তো হল দুই কান
যখনি 'দোকান বন্ধ' তখনি দো কান বন্ধ
এই হল সহজ ব্যাপার।

তুমি কি বুনেছ অভিমান
গৌরাঙ্গ ভৌমিক

হলুদ রঙের গাড়ি
একবার ঢুকেছিল চাপা এক গলির ভেতর,
একবার থেমেছিল
চৌদ্দতলা বাড়ির ছায়ায়।

সে ছায়া বেঘোর ছিল—ঘোর ঘোর
তোমার শরীরে ক্লান্তি যেরকম ছায়া ফেলে
ঠিক সে রকম,
কিছুটা হলুদ নীল ছায়া।

আমার প্রখর নয় স্মৃতি,
হলুদ রঙের গাড়ি ছিল কি তোমার?
হলুদ রঙের গাড়ি প্রতিদিন ঢুকে যায়
চাপা এক গলির ভেতর।

তুমি কি বুনেছ অভিমান? ঐখানে
ফিকে নীল
চৌ-ঘেরা বাগান ক্রমে গোলাকার
হতে থাকে,
ক্রমে ক্রমে গোল।

হয়তো কোথাও আছে ভুল।
নিজেকে গোপন করতে
তুমি রোজই ফিরে যাও নিজের দরজায়,
টোকা মারো।

সাড়া নেই।

অন্য সকাল
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় (গীতিকার)

কথা নয়, আজ কোনো কথা নয়
সব কথা ফুল হয়ে গেছে
হলুদ গোলাপী নীল লাল
এ কেমন অন্য সকাল!
এক ঝাঁক বুনো প্রজাপতি
রোদ্দুরে করে মাতামাতি
দলছুট পাখি দু'টো
এখন কোথায় যাবে—
ভেবে-ভেবে সারা হয় আকাশ-পাতাল!

রূপালী নদীটা দিশাহারা
ভুল করে দেয় কাকে সাড়া
অশান্ত দুটি ঢেউ
কানায় কানায় এসে
কে জানে কিসের টানে হ'লো উত্তাল।

এ কেমন অন্য সকাল!

অপাপবিদ্ধা

সাধনা মুখোপাধ্যায়

তোমার নিষ্পাপ গালে
জলের বিন্দু লেগে আছে
বল না বালিকা তুমি
অশ্রুর কারণ?
তোমাকে কি কোন স্থানে পেয়ে নির্জনে
তাড়না করেছে কোন নিষ্ঠুর বালক
কেড়ে নিয়ে গেছে হাত থেকে
তোমার ও শ্রমলব্ধ
নীলকণ্ঠ পাখির পালক
কেঁদো না বালিকা তুমি
তুমি কাঁদলে কষ্ট পৃথিবীর
বৈশাখে প্রাবৃট ঋতু শুরু হয়ে যায়
অলক্ষে হৃদয়ে বারি
অশ্রু সুনিবিড়...
অপাপবিদ্ধা তুমি
অহঙ্কারহীন এক
পবিত্রতার ছবি আঁক।
তুমি কাঁদলে পৃথিবীর
অন্তর ব্যথিত হয়
তার বহু যুগ আঁকা বাঁকা
অর্দ্ধচাঁদ পূর্ণচাঁদ প্রতিপদ
অমাবস্যা স্তাবায়ন
সমস্ত পেরিয়ে
তোমার মূর্তিটি সে সম্পূর্ণ করেছে
যে বালক কেড়ে নিল তোমার পালক
তার যেন পিঁপড়ের পাখা
নিশ্চিন্ত থাক তুমি মনে মনে
প্রায়শ্চিত্ত করবে সে
ভীষণ গভীর এক
যৌবনের বনে।

সেখানেই জয়

তুষার রায়

এই দেশ তোমাকে গভীরে ভালোবাসি
এই জল হাওয়া ও খাদ্য
রক্তের ভিতরে খেলা করে
নিশিদিন।
প্রেম তুমি ক'রকম খেলা জানো
জানো ইতিহাস
ভূগোলের প্রতিটি ব্যাপার?
তারপর কি বিচিত্র মানুষের
প্রগাঢ় মিছিলে
তুমি কোথা ছিলে, কোনখানে
তবু তুমি জেনে রেখো
এই প্রেম একবারই হয়
এই বিস্ময় এই সৃজন ক্ষমতা
যদি কাজে লাগে; মানুষের
সেখানেই জয়।

লম্বা দেয়াল

পূর্ণেন্দু পত্রী

দেয়াল লম্বা হয়ে উঠছে চারপাশে।
ওরা ব্যস্ত হাতুড়ি পেরেক দুরমুশ নিয়ে
ওরা ব্যস্ত চুন সুরকি সিমেন্টে
ওরা ব্যস্ত ভাঙা কাচের টুকরো নিয়ে।
ভাবছে এইভাবেই গাছ থেকে আলাদা করে দেবে
ফুল
ফুল থেকে উপড়ে নেবে গন্ধকেশরের ডাঁটাগুলো।
নারী স্পর্শ করলে
আমরা হিমালয়।
কবিতা রক্তে হাত রাখলে
আমরা সাত-ঘোড়ায় টানা সূর্যের রথ।
দেয়ালটা কত লম্বা করে বানাচ্ছ হে?
আমাদের জুলপি ছুঁতে পারবে তো?

দেয়াল লম্বা হয়ে উঠছে চারপাশে
গাছতলায়, পুকুরে, পদ্মপাতায়
ঠাট্টা-ইয়ার্কি-মসকরায়-মজলিসে
গেলাসে, গর্ভে
কার্পেটে, কাঁথায়
ধনুকের মতো বাঁকানো ভুরুর দুদিকে।

আটটি অসুখী লোক

দিব্যেন্দু পালিত

যৌথভাবে একক কফিখানায়
ধান ভেনে যায় আটটি অসুখী লোক;
আধ্যাত্মিক মতে তাদের শোক
বোঝে না যারা তারাই অর্থনীতির
অধ্যাপক ও সাবেকী বুর্জোয়া।

ভিতরে নদী দুঃখে স্বচ্ছতোয়া।

দুঃখ উথলে ওঠে কানায় কানায়—
ভাসে অবাক বেবাক মাছের দল;
যে-নারী হয় লক্ষ্যে রজস্বল
তোয়াজে তার ছি-ছি কাঁপায় শির।

এ নয় ধান ভানতে শিবের গাজন—
আটকে-পড়া মাছ কচুরিপানায়।
মার্ক্স লেনিনের চৌখুপি এই ঘরে
সারাক্ষণই মন কনকন করে—
বিজ্ঞাপন শেখায় দাঁতের মাজন।

ছেলেটা

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

গাড়ির সামনে এসে পড়েছিল চার বছরের ছেলেটা।
গালাগালি ও ভিড়,
একটু দূরে পথের স্থায়ী ভিখিরিদের সংসার।

'তুই কার ছেলে, কে তোর মা, হতভাগা?'
ছেলেটা অপ্রস্তুত
অঘটন কিছু ঘটেছে, সেটা কী—জানে না।
গাড়ি এগিয়ে যায় অগত্যা
এবং নিমেষে এগিয়ে আসে বিশাল খাণ্ডার মা।
প্রকাণ্ড বাঁশ পড়ে চার বছরের শরীরে,
পিঠে পেটে মাথায়।
কংক্রিটের ধরিত্রীতে মাথা রেখে লুটিয়ে কাঁদে ছেলেটা
ফিরে ফিরে মার খায়।

একবার শুধু হঠাৎ
পালকের মতো চোখ তুলে আমার দিকে তাকায় ও
আর আমি—একমাত্র অক্ষম বিচারক—
দ্রুত পালাতে থাকি দূরে।

বাংলার শরীর থেকে

কৃষ্ণ ধর

বাংলার শরীর থেকে
অজস্র রক্ত ঝরছে এখন।
নিজের পুত্রের যৌবন
ধার করে নিয়ে
পিতা এক নির্বিকার নপুংসক যুবা।
নিহত সন্তান সব
পড়ে আছে ফুটপাতে শিউলি ফুলের মতো
নিষ্পাপ নির্মল
মায়ের আঁচলে মাথা পেঁতে।
কতকাল ঘুম নেই তন্দ্রাহীন চোখে
এখন ঘুমোয় এক অদ্ভুত জ্যোৎস্নায়
ম্লান হেসে।

কোন একটি স্বপ্নালু মেয়েকে

কল্লোল বিশ্বাস

আকাশের যত নীল
তোমার চোখের নীড়ে তারি সমারোহ।
ভোরের আকাশ তুমি
আলোকের আবির্ভাবে স্বতঃপ্রাণোচ্ছলা।
কুয়াশার সকালের মতো
অর্ধেক ফুটেছো তুমি পৃথিবীর চোখে।
তোমার প্রাণের স্রোত কত যে চপল
সবুজ স্রোতের ঘাতে পাহাড়ের নদী
উচ্ছল আনন্দে মেতে নেমে যায় খাত বেয়ে বেয়ে
তুমি সেই বাধাহীনা সবুজ স্রোতের মতো মেয়ে।
আকূল কত যে নিশি স্বপ্ন মিঠে ভোর
গানের অনেক সুর আনে অনায়াসে
তোমার নদীর মতো
ঊষার আলোর মতো
অনুপম করি তার মনে
ধরা যাক তুমি এক স্বপনের চোখে দেখা
সুবিস্তৃত মাঠ, সেই মাঠে আনন্দের ডাক তোলে
নানান রঙের, সব পাখি—পাখালিরা;
সেখানে 'দীঘর' বিল, জল কাঁচে দোলে পদ্মফুল
বহুতর নীরবতা ভরা সব তন্দ্রার দুপুরে।
তারপর সেই জলে ঝিঁঝিঁ ডাকা রাতের
পাতা-ছাওয়া, পদ্ম-ছাওয়া কাঁপা কাঁপা জলে
স্বপ্নের চাঁদের মেয়ে ঢেউ ঢেউ খেলা করে ফেরে।

হে দেয়ালপুরুষ

তুলসী মুখোপাধ্যায়

কত তীব্র সেঁকো বিষ তোমার কামনা,
হে অঙ্কুরিত দেয়ালপুরুষ—
মানুষ জানে না!
তোমার আলোকতৃষ্ণা
অন্ধকার লোকায়তে আলোকের তৃষ্ণা জাগায়
তোমার অমৃত সাধনা
মৃতকল্প দশদিকে জীবনের বাসনা পাঠায়...
অতএব সিদ্ধি এসে সকাম শরীরে
খুব ঘন আলিঙ্গন করেন তোমাকে
ফলে আলোকিত সৌরালোকে
তুমি আরো এক অমর বিগ্রহ।

কত নগ্ন স্বার্থমগ্ন তোমার কামনা
হে পরিণত দেয়ালপুরুষ—
মানুষ জানে না!
মানুষ জেনেছে শুধু
আলোর বাকলে তুমি তো আলোকতৃষ্ণা
অমৃত-বাকলে তুমি তো অমৃতসাধনা...
তোমার গোপন কামড়
মানুষ জানে না!

অনৈসর্গিক

নবনীতা দেবসেন

কেন ডাকো, কেন ডাকো বুকে টোকা দিয়ে
এই বদ্ধ মধ্যরাতে কে খোলে দরোজা
ধ্রুবতারা অর্ধচন্দ্র ইত্যাদি পড়োশী
সকলেই শুনে নেবে ত্রস্ত খিল খোলা
স্তব্ধ যামে শব্দ করে শিশির বিন্দুরা
খলখল ব্যস্ত হবে নিন্দা রটনাতে
কৌতূহলে ঝরে পড়ে শুকনো পাতা ঠিক
শুনে নেবে চুম্বনের অর্ধস্ফুট ভাষা
হাসনুহানা বলে দেবে রজনীগন্ধাকে
তোমার উরুর লাল জড়ুলের কথা—
কেন ডাকো, কেন ডাকো বুকে টোকা দিয়ে
স্তব্ধ রাতে প্রতিধ্বনি শুনে নেবে হাওয়া।

সঙ্গিনী

নচিকেতা ভরদ্বাজ

দুঃখ পাও—আরো দুঃখ। যন্ত্রণায় জ্বলুক হৃদয়।
তুমি আমি দুইজন বেদনার আভিজাত্যে ম্লান।
মানুষের ঘরে আসবে; দুঃখে; জ্ব'লে সতী হও আগে—
সোনার মতন দীপ্র। তা না হলে কী করে অভয়
আমাকে দেবে যে তুমি, গাইবে এত শ্রাবণের গান!
যন্ত্রণার উৎসে জন্ম; জীবন বিচিত্র বর্ণ যন্ত্রণার রাগে
শিয়রে নীলাশ্রু মুখ—যৌবনের অন্য নাম আলো।
ভালোবাসো সে কেবল যন্ত্রণার—উজ্জ্বল সংগীত—
এ সুরে মেলাবে কণ্ঠ—ভালোবাসবে মানব শিশুকে,
যন্ত্রণার পারিপাট্যে তুমি হবে মেঘমগ্ন মৌসুমীর কালো—
সাজাবে সংসার, সখী; তার আগে পৃথিবীর আত্মচরিত
পাঠ করে নাও, তরী সমুদ্রে ভাসুক সম্মুখে।

আদিম নাটকে স্রষ্টার বিয়োগান্ত নিপুণ ভূমিকা
তোমাকেও নিতে হবে; পুতুল বানাবে একা কোমল আঙুলে
যন্ত্রণার শুদ্ধ মোমে। অতএব, বসন্ত-নায়িকা,
যৌবনকে বুকে বাঁধো; যন্ত্রণার সোনালী প্রস্তাবে
সুনীল আকাশ দেখো সায়ন্তনী বিরহকে ভুলে
সূর্যের সোনার পদ্ম বুকে নেয়; তোমাকেও নিজেকে গালিয়ে
নতুন নদীর ধারা এখানে বহাতে হবে জ্যোৎস্নার উপলে!
কী করবে: যন্ত্রণার বীজ আছে সৃষ্টির স্বভাবে।
নীলকণ্ঠ এ আমাকে উন্মীলিত যন্ত্রণার সুখে
বুক বেঁধে নেবে বলে যৌবনের আহুতি জ্বালিয়ে
নিজেকে ভাসাতে হবে সন্নিহিত সন্ধ্যায় কল্লোলে!

কাঁদো সখী, আরো কাঁদো। অশ্রুসিক্ত অনিন্দিত মুখে
ফুটুক যন্ত্রণাযূথী—। তবে তুমি তিলোত্তমা হবে।
যন্ত্রণার পথ ধরে ফিরে এলে সংসারের সমুদ্র উৎসবে
নদী হবে অতঃপর—! নিত্যবহ মহানদী—
তুষার গলাতে হবে যৌবনের বুকে।

উঠে আসছেন তিনি

শান্তিকুমার ঘোষ

ছেলেবেলায় ঘুম ভাঙলে দেখতাম জলে-ধোওয়া আলোয় ঘর গিয়েছে ভরে
নদীর ঠিক শিয়রে খাড়া পাহাড়
মনে মনে ভেবেছি জমে থাকা দুধের ফেনার মতো মেঘ ছাড়িয়ে
তিনি বসেছেন স্ফটিক আসনে
ছুটে যেতাম পথ করে নিয়ে
মধুগন্ধী ঘাস, ঘাস-ফুল ফেলে...পাদভূমির অরণ্যে
সূর্যহীন অন্ধকার আক্রমণ করেছে আমাকে
বুনো পাখির চঞ্চু বিক্ষত করতো বাহু
দুলতে থাকতাম আশায়
কত উপরে চলে পাকদণ্ডী, তার দু'ধারে তুলসীর বন, কুসুম উপত্যকা
হেমকুণ্ডে বিদ্যুৎ-স্পর্শের মতো ম্লান
অমরতা

আজ দেয়াল জোড়া আয়নায় তাকিয়ে দেখি
মুখ রয়েছে বেঁকে, চোখ গিয়েছে বসে
তুলে-ধরা হাতের অনামিকায় শুকিয়ে এসেছে প্রেম
কখন মধ্যম থেকে খসে পড়েছে অঙ্গুরীয়
আমি প্রাসাদ ছেড়ে নেমে এসেছি ক্যারাভ্যানে
আমাকে সুদ্ধ ক্যারাভ্যান কি উড়িয়ে নিয়ে যাবে
বড়ো সমুদ্রের মুখে...
চিতার জ্বলন্ত আঙার ঝরছে সেই জলে
পাপ ধুয়ে যাচ্ছে স্রোতে
আর অন্ধকার ঢেউয়ের মাথায় আলো দুলিয়ে
গভীর থেকে উঠে আসছেন তিনি
মকর বাহনে।

কৃশানুর সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে শুভেচ্ছা জানাই
কৃশানু দীর্ঘজীবি হোক

নিভৃতা সেন
হিরণ্ময় সেন
বেগমপুর

শিল্পী : চারু খান। (পুনর্মুদ্রিত)

সূচিপত্র

কবিতাবলী

কবি মায়ারানি সাহা এর

কাব্যগ্রন্থ

জীবন তরী

কিছু কথা

নদীমাতৃক বাংলাদেশের জীবন সংগ্রামে নদী যেন সহযোদ্ধা, প্রণয়ী, বা প্রণয়িনী, প্রাণসখা, বা সুজন। তার জলধারার শব্দে যেন জীবনের কলোচ্ছ্বাস। সে নদীর সঙ্গে আশ্লিষ্টজনের ভাবনায় নদী তার গ্রামজ সংস্কৃতির সহচর হয়ে মিলেমিশে আছে। তাকে নিয়ে কত ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, কত রঙ্গরস। কত অভিমান। লেখকের কলমেও নদী তাই জীবনের সাযুজ্যে। নিত্য তার সঙ্গে হৃদয়ের সহবাস। সেখানে উথলায় ঢেউ। আর, তখন সৃষ্টি হয় মরমী কবির আত্মনিবেদনের অনুপ্রেরণা। কবিতায় কবিতায় ভরে ওঠে খাতার পাতা। আত্মজনদের কাছে পৌঁছাক সে কবিতা।

পর্ণশ্রী, বেহালা, কোলকাতা।

অন্তহীন প্রকাশনী

১৩৭এ, বি ব্লক, সোনালীপার্ক, বাঁশদ্রোণী

কোলকাতা - ৭০০ ০৭০

তোমাকে কি

পবিত্র সরকার

তোমাকে কি ভালবেসেছি কখনও ? তোমার প্রেমের দীক্ষা
প্রার্থিত ছিল ? বুঝি না। বেশ তো! জনমতের সমীক্ষা
করে দেখি সেই কথা কী দাঁড়ায়—কার দিকে ঝোঁকে পাল্লা।
মাইক ধরে ধরে রাস্তার লোক, ভিখারি ও মাঝি-মাল্লা—
সবাইকে কেউ প্রশ্ন করুক, ওই যে অমুকচন্দ্র—
সে কি মহিলাকে ভালবেসেছিল, করেছিল দমবন্ধ
সেই প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে ? সুন্দরী, আয়তাক্ষী
তার ভ্রূভঙ্গে বাবু কেঁপেছিল ? আপনারা তার সাক্ষী ?
ওরা যদি বলে, 'এই ঘটনাটা, মনে হয়, ছিল সত্য।'
আমি তো হাসব অট্টহাস্য, কাঁপিয়ে স্বর্গমর্ত্য।
বলব, 'দাদারা, সার বেঁধে সব জাহান্নামেই যান না।'
তারপরে কোনো আঁধার আড়ালে লুকোব আমার কান্না।

স্বপ্নের ভিতর মানুষ

দেবকুমার দত্ত

নীলনদের প্লাবন আনে পলিমাটির ভিতর স্বপ্নবীজ
কৃষকের সৃজনশীল লাঙল
বীজের অন্তর্লীন শস্যস্বপ্নকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলে।
অনেকটা ঠিক এভাবেই
স্বপ্নের ভিতর মানুষের বসবাস
পক্ষান্তরে মানুষের ভিতরও স্বপ্নের নিত্য আনাগোনা।

স্বপ্ন সঞ্চরমাণ বর্ষার মেঘের মতো,
দু'হাত তুলে ডাকলেও স্বপ্ন মানুষের করতলগত নয়!
লেজ-নাড়া কুকুরের মতো
স্বপ্ন এখনও ভাত-কাপড়ের লক্ষ্যে কারো মানেনি বশ্যতা।

স্বপ্নের ভিতর মানুষের ঘর-সংসার
মানুষের ভিতরও স্বপ্ন শরতের চালকুমড়োর মতো বাড়ে।
স্বপ্ন মানুষ মিলে তুলে আনে জীবনের গুহ্য সারাৎসার।

রথীন কর-এর তিনটি কবিতা

রঙ

কিছু রঙ থেকে যায়
নতজানু হৃদয় জুড়ে
নিকাশিনালার মুখে
জড়ো হয় বিবর্ণ মেহেন্দি
ছুঁড়ে ফেলা প্লাস্টিকের মতো
অজ্ঞান অন্ধকারে

কিছু রঙ থেকে যায়
বাবুই বাসায়
কিংবা স্রোতস্বিনী প্রবাহে
কানাগলি
একলা ঘুপচি
জটিল কালির তরলতা

সব রঙ মুছে গেলে
বেঁচে থাকা
অর্বাচীন কিছু রঙ নিয়ে
তখন রঙ মিলানতি তোমার
শরীরী উঠোনে

তৃতীয় নয়ন

মাটির খাঁজে খাঁজে স্বপ্নবীজ
বীজ মানে জীবনের গান
জল পড়ে
বৃষ্টি ঝরে
মাটির আঁচল বেয়ে—
চারপাশে মন ভালো করা আলো
বাতাসের আলোয়ান জড়ানো
মাটির খটখটে শরীর
রসবন্ত হয়ে ওঠে
মাটি আঁকি
কথা বলি
আনাড়ির আঁকিবুকি
মায়ের আঁচলে

ছুটে আসছেন মা
যোজন যোজন
মেঠোপথ
আহা কতদিন
খরার জেরে মায়ের বুকে
দুধ ছিল না
শুকনো স্তন চুষতে
চুষতে রক্তক্ষরণ
ক্ষরণ...

আমাদের সমস্ত কলঙ্ক বুকে
নিয়ে মায়ের তৃতীয় নয়নে
অনন্ত অলীক বিভা...

আদিম

আজকে সকালবেলা
দু'চার পশলা
শিউলির ডালে পোখরাজ
দু'চার ফোঁটা

শান্তিসংঘের মাঠে সারাদিন
নবীন বাতাবি বুকে রাতদিন
খুঁজে ফেরো মুক্তির আকাশ
খুঁজে ফেরো বিশ্বাসী বাতাস।

হাজামজা ডোবায় ডুবে যায় ফ্যাকাশে
চাঁদ অচিন জলস্রোতে এগিয়ে আসে
আদিম শোণিত ধারা অদেখা আড়ালে

তোমার কথায় জলে নামলাম
কূল কই জল থৈ থৈ পথ হারালাম
সকালবেলার দু'চার পশলা
বিষাদ সন্ধ্যায় দানবচর্চা

আস্তাকুঁড় হয়ে ঘরে ফেরো মেয়ে
আর যেও না অসহ কালীদহে
দিনশেষের নিঃসীম প্রদাহ
কুমারী কঙ্কালে মলিন
প্রবাহ

মরচে-পড়া পুরনো লোকজন অদূরে
খানিকটা গল্পের গন্ধে নড়ে ওঠে।

সংযুক্তির স্মারক

হাসানআল আব্দুল্লাহ

আপনারা যারা হেঁটে গিয়েছেন দূরে
আপনারা যারা ফিরে এসেছেন ঘরে
আপনারা যারা বেঁধেছেন সুরে সুরে
আপনারা যারা গিয়েছেন অবসরে

শত আনন্দে করেছেন যারা কুহু
আপনারা যারা সময়ের সাথে সাথে
হয়ে গিয়েছেন অধরা অস্থ রুহু
আপনারা যারা হাত বেঁধেছেন হাতে

আপনারা যারা মঞ্চে উঠেই কবি
আপনারা যারা সদম্ভে আলোকিত
আপনারা যারা চারিধারে নিজ ছবি
টানিয়ে টানিয়ে হয়েছেন গর্বিত

আপনারা যারা সম্মোহনের ডাকে
শঙ্কিত সব রাস্তা পিছনে ফেলে
এগিয়ে গেলেন সকলের আগে আগে
প্রজাপতি, যেনো দুখানা পাখনা মেলে

তরুণ বয়সে আপনারা যারা বুড়ো
সূর্য দেখেও হৃদয়ে সাজিয়ে কালো
আপনারা যারা বলেন, জাগ্নে ধুরও!
আপনারা যারা পথে বিছালেন জালও

তাদের বলছি থাকুন যেখানে আছেন
যতোটুকু হোক সময়কে হাতে ধরে
যেভাবে পারেন সেভাবেই শুধু বাঁচেন
না-যান কখনো অনেক নিচুতে পড়ে।

মনন দাস-এর তিনটি কবিতা

কেমন আছো নিভৃতা

১.

বুকের চাতাল খুঁড়ে তুমি খুঁজেছিলে গুপ্তধন
কিছুই পেলে না খুঁজে, বৃথা হলো সব অন্বেষণ
অথচ অনেক ছিল মণি ও মাণিক্য ভাণ্ডার
গভীরে কোথাও ছিল সুপ্ত কোনো অবস্থান তার।

এখন আমার বুকে অজস্র অন্ধ গহ্বর
রক্তের ধারা স্রোত যন্ত্রণায় ঝরে নিরন্তর।

২.

কোনো কোনো আঘাত থাকে সুপ্ত
কোনো কোনো আঘাত সময়ের ঘর্ষণে
ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যায়।

সুপ্ত আঘাতগুলি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতন
কখন যে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে যায়!

তোমার আকাশ থেকে ছুটে এসেছিল যে সকল উল্কাখণ্ড
দীর্ণবিদীর্ণ করে আমার পৃথিবী
চিরস্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছে
সেখানে বহতা অশ্রুস্রোত।

আঘাতেরা শব্দ করে স্রোততলে নুড়ির মতন
স্রোতের ভিতর স্রোত—চোরাস্রোতে নড়াচড়া
হয়ত বা মুক্তির আশায়।

৩.

আমরা হেঁটেছি বৃষ্টিতে পাশাপাশি
আমরা মেতেছি বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে
মেঘ হাওয়া আর আকাশের উল্লাসে
উতরোল হয়ে ভেসেছি যে মনসিজে
নিভৃতা, মনে পড়ে সে কথা!

আমরা হেঁটেছি পউষের রোদ্দুরে
মৌরী ক্ষেতের সুবাস বুকেতে ভরে
হিমেল বাতাসে রৌদ্রের নিবিড়তা
আদর করেছে আমাদের ঘিরে ঘিরে
নিভৃতা, মনে পড়ে সে কথা!

আমরা হেঁটেছি সুনীল সাগর কুলে
সোনালী বালুকা জড়িয়েছে পায়ে পায়ে
উদ্দাম ঢেউ ছুটে এসে উল্লাসে
ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদের গায়ে গায়ে
নিভৃতা, মনে পড়ে সে কথা!

সব উচ্ছাস মেখে নিয়ে ফিরে এসে
আমরা বসেছি মুখোমুখি দুইজনে
নীরব সুরেতে ভরেছে শরীর মন
স্নিগ্ধ আঁধারে নিভৃতে ও নির্জনে।

এখন সেসব বিভ্রম মনে হয়
কোন সুদূরের সুখের স্বপ্নময়
স্মৃতির ভিতর স্বপ্নেরা খেলা করে
শূণ্য মায়ায় কবোষ্ণ হাত ধরে।

প্রতীক্ষা

জীবনময় দত্ত

বলেছিলে আসবে
আমার মিথ্যা
নিয়ে ফিরে যাবে। আরও
বলেছিলে, আমার অহংকার
আর পাপ গ্রহণ করবে।
ঘৃণা আর ক্রোধ
তাও নিয়ে যাবে। এভাবে
আমাকে নির্ভার করে
আমার দূষণ দূর করে দেবে।
সেই থেকেই তো আমি
নদীর ঘাটে যাই শুচিশুদ্ধ
হবার অসীম তৃষ্ণায়। আলোর
শিরোস্ত্রাণ পরে প্রতীক্ষায় রই
কোন্ পার থেকে তুমি আসবে
নৌকো বেয়ে
অগ্নিগর্ভ সময়ের হাত ধরে।

উন্মাদ

পান্নালাল মল্লিক

করতল প্রসারিত করে যখন বনলতা সেনকে বললাম
কাঁদো,
পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে চাইতেই—
অকাল বর্ষণে ভেসে গেল গঙ্গা যমুনা সরস্বতী,
ভাসিয়ে নিয়ে গেল ভারতের যা কিছু নির্মাণ।

হাত ধরে সুন্দরকে যখন বললাম
কিছু বল,
কথাকলি কুচিপুরী অথবা কত্থকের নানান মুদ্রায়
পা ফেলতে না ফেলতেই—
খান খান হয়ে গেল পায়ের নীচের মাটি,
ভারতবর্ষ।

আঙ্গুলের ডগায় কলম গুঁজে দিয়ে যখন বিশ্বাসকে বললাম
কিছু লেখ,
গল্প কবিতা প্রবন্ধে মানুষকে ধরতে না ধরতেই—
ভীষণ শব্দে কেঁপে উঠল পায়ের নীচের মাটি
ফেটে গেল ঘরের অলিন্দ,
যেখানে জানলার ধারে বসে অমল
দইওয়ালাকে ডাকছিল।

বাইরে তখন ধূলোর ঝড়
বাজের ঠোঁটে পূর্ণিমার চাঁদ,
উন্মাদ সূর্যকে বন্দী করে
দাঁড়ে বসিয়েছে এক ঝড়ের পাখি,
চাঁদকে নির্বাসনে দিয়ে এক অন্ধকার গহ্বরে
শতাব্দীর ফসিল জড়ো করে প্রতিদিন তাই নিয়ে
জীবন-মৃত্যুর খেলায় মেতেছে উন্মাদ,
আর যাইহোক তাকে মানুষ ভাবা অন্যায়।

নিয়মের গণ্ডি

আরতি দে

বিলিয়ে দাও সুখের খবর
দাও ছড়িয়ে সমৃদ্ধি কথা
দুঃখ কাহিনি ফুলে ফেঁপে
উঠুক বুকের ভেতর
ভাঙা মনের খনিজ পদার্থ
ভাসুক জলতরঙ্গে।
মাখে যদি মননে আগুন
দাও নিভিয়ে অশ্রুপাতে।
বিপন্ন মানুষের খুব কাছে যাও
অনাহুতকে বুকে।
সযতনে রেখো আপন সম্পদ
ভালোবাসায় যদি খাদ থাকে।

তারকেশ্বর চট্টরাজ-এর দুটি কবিতা

বসুমতী

এই মাটি এই ঘর
কাকলি জড়ানো কত সবুজের বিভা
নিয়েছিল একদিন বুকের ভেতর,
তৃষিত আমার প্রাণে
মায়াময় বিভূতি তার
মায়ের মত জীবন সুঘ্রাণ।

কত দিন কত কাল আগে যেন
এই ঘাসে রেখেছি পা
মনে তো পড়ে না ঠিক
মনে হয় নিরবধিকাল
আমি আছি, আমিই ছিলাম।

থেকে যাব নিয়ে
এখানের ঘাসের গন্ধ
ফুলের সুবাস
পাখির পাখায় স্নিগ্ধ
রোদের সন্দেশ।

কত প্রিয়জন
এই মাটি এই ঘরে
রেখেছে সুবাস তার,
তারা কেউ চলে গেছে
কেউবা জড়িয়ে আছে আজও
আমার এ রিক্ত জীবন।
এ সংসারে রিক্ত তো সবাই
আসে সব রিক্ত হয়ে
যায়ও রিক্ততা নিয়ে কিছু,
শুধু তুমি থাকো মা
আর তোমার গন্ধে জড়িয়ে থাকে
আমাদের জীবনের সুধা
বিষমাখা যন্ত্রণাদাহ
বেঁচে থাকা তারই জন্যে শুধু।

কোথা যাব, কোথা যে যাব না
নেই তার ঠিক,
আবার তুমিই নেবে তুলে
বিকশিত হবে শত ফুল
ঝরনার শতমুখী স্রোতে
সিক্ত হবে এ রিক্ত হৃদয়।

মন

মনের মধ্যে মেঘ জমলে
সূর্য দরকার
মেঘ গলে বৃষ্টি হয়
ভাসে সাগর নদী
প্রিয়তম সব।

কে কাকে ফিরিয়ে দেয়
কে নেয় কাকে
হানা তো সেইই দেয়
যে বড় প্রিয়
কেউই কি রাখে না খোঁজ
কত না মনের ক্ষত।

মন বড়ো কালো মেঘ
কী যে হয় কখন তার
কেউ জানে না
গোপনে কত না মন
কেঁদে কেঁদে গলে যায়
নদী হয় শেষে।
সব নদী মেশে না সাগরবুকে
অধরা সাগর তার সারাটা জীবন
সে তো তবু নেয়েছিল
আশরীর ভিজেছিল
অঝোর বৃষ্টিতে।

সূর্যই ভোলাতে পারে
কাঁদাতে পারে তাকে
কেঁদে কেঁদে সব কাঁদা
হাসি হয়
বৃষ্টি হয়
জল আনে চোখে।

চোখে জল
মনে জল
হৃদয় নদী
ঘাটে ঘাটে বয়ে যায়
ছুঁয়ে যায়
মন নিরবধি।

ধ্রুব বসু-র দুটি কবিতা

নির্ভয়

হিমতমসায় কে কাঁদে ওই
নির্ভয়া এক নির্ভয়া দুই
কাঁদে মাতৃ-আধারস্বরূপা
নির্ভয়া এক নির্ভয়া দুই।

হৃদগহনে পুণ্য তটিনী
ভাসাই যদি সাঁজবাতি
মাতৃরক্তে ভরা সে নদী
ভাসাব কোথায় স্মৃতির বাতি?

কৌশালিকা চোরাবালি
দুঃখগাথা করছে হরণ
নারী তুমি অর্ধেক আকাশ
অর্ধেক আকাশ রিপুর দহন।

সদানন্দ প্রদায়তা
জীবন তার গড়া দুঃখে
আপন মাংসে হরিণী বৈরী
রাজপথে দিবালোকে।

হিমতমসায় কে কাঁদে ওই?
নির্ভয়া এক নির্ভয়া দুই
জাগে শক্তি-আধারস্বরূপা
নমস্তস্যৈঃ নমস্তসৈঃ নমস্তসৈঃ।

দীর্ঘ কবিতা

অনেক তো হল লেখা দীর্ঘ কবিতা
এবং দুঃখনদীর ঢেউ গোনা,
জ্বলেছে কি ভালো
আমাদের ধূসর সত্তায়
এক প্রাণবিন্দু আলো?
এত শত অসংবেদ্য শব্দের অঙ্গরাগ
এত শত ঝংকার
এত বিলাপের বিনয়
এত ছন্দের অভিনয়
কি পেলো সময়—
কবিতার বাতাস
না কি ঈশ্বরের আলো?

বরং ভালো
লাগ লাগ যাদুর খেলা
সংস্কৃতির মঞ্চে
এক বাহাত্তুরে খেলা দেখায়
এক ষোড়শীর সঙ্গে
মঞ্চে যাদুওয়ালা বার করে
শত শত কবি
সংস্কৃতির মুখোশধারী প্রতিষ্ঠান সেবী।

হে স্বেচ্ছাত্মবিস্মৃত—
আগুন হও

কিন্তু উত্তাপ দিও না,
প্রজ্বলিত হও
কিন্তু প্রতিস্পর্ধী হয়ো না,
মুখর হও
কিন্তু মুখ খুলো না,
কবি হও
কিন্তু অসির থেকে
মসীকে বড়ো করো না।
বলো, 'ওঁ বিশ্বায়নায় নমো!'
বলো, 'ওঁ ভোগবাণিজ্যায় নমো!'
বলো 'ওঁ রতিক্রিয়ায়ই নমো!'
বলো, 'ধর্ম মুনাফা, কর্ম মুনাফা, মূল্যবোধ মুনাফা।'

কে যেন চাঁদ খুলে এনে
চাকায় লাগিয়েছিল
দুটি ফিতেয় লজ্জা ঢাকে যে নারী
সব জ্যোৎস্না সেই তো নিয়ে নিল।

মেঘের কাছে হাত পাততে পারোনি
তাই কুয়াশায় ভাসিয়ে দিয়েছ
তোমার অপরাজিতা-বর্ণ ছাতা,
সে ছাতা কোথায় হবে স্থিত
কবি কি ভেবেছ কখনও—মিত বা অমিত?

এবার পরিক্রমা সারো
চা-বাগান আর কৃষকের অশ্রুর
এবার পরিক্রমা সারো
বিলকিস আর কাজ-হারানো মজদুর,
এবার পরিক্রমা সারো
পথশিশু আর বস্তির
এবার পরিক্রমা সারো
ম্যালেরিয়া আর ডেঙ্গুর
এবার পরিক্রমা সারো...
পথের ক্লান্তি অর কতদূর?

এই তো লিখেছ কবি—
"আমি তো কবিতা থেকে দূরে গিয়ে
কাটাতেও পারি।"
স্বাগত কবির নূতন উন্মোচন
এবার একবার দূরে চলো মন।

ভারসাম্যের খেলা শেষ
সৎ হতে আমাকে অসতে নিয়ে যাও
ভারসাম্যের খেলা শেষ
সুর হতে আমাকে বেসুরে নিয়ে যাও
ভারসাম্যের খেলা শেষ
আলো হতে আমাকে অন্ধকারে নিয়ে যাও
ভারসাম্যের খেলা শেষ
ধর্ম হতে আমাকে যাবতীয় বৈধর্ম্যে
নিয়ে যাও।

আমরা এবার এসে গেছি সায়াহ্নের ঘাটে
মা সরস্বতী বসে যেথায় লুকিয়ে একধারে
দিনশেষের শেষ খেয়া নিয়ে আসেন কবি
কালো জলে ভাসিয়ে দেবে শব্দজাহ্নবী।

প্রণব পাল-এর তিনটি কবিতা

ডাকনাম

ফেলে দেওয়া আবর্জনায় সাজিয়ে তুলি পংক্তি। নাটবল্টু খুলতে খুলতে
একটা মহাকাশ ধ্বসে পড়েছে। আমাদের চারদিকে যন্ত্রণায় ছটফট
করছে ভাঙানক্ষত্রের কাটামুণ্ডু। ঝিলমিল আর ঝিকমিক ছড়িয়ে আছে
উঠনময়। পায়ের তলায় বিঁধছে হীরে কুচি।

ছোট অক্ষরেও বড়ো কথা লেখা যায়। বড়ো বড়ো জোড়াই চলছে পেরেকের
ডুবসাঁতারে। এইসব তুচ্ছ তাচ্ছিল্যেরা আছে বলেই না হাওয়া খেলছে
দরজায়! জানালায় মুনিয়া চড়াইয়ের ফাতরামো। মেঘ দেখছ
আর বিন্দু দেখছ না! ফোঁটা ফোঁটাই তো ফুটছে সমস্ত হয়ে।

এবার ভাঙাচোরা টুকরোয় নিজের ডাকনাম গড়ো। তাকে ভাঙো
অজস্র বিমূর্ত সংকলনে। আকাশের ফুটোফাটায় রিপিট নয় তারার
চুমকি আর আহ্নিক বার্ষিক বসাও। একটা মহাকাশি
ধুন্ধুমার লাগাও গাছের টবে। ফুল নয় নক্ষত্র ফুটুক। এক চামচ
জ্যোৎস্নায় চাঁদ উটুক ছাদে ছাদে।

রং

কলম নিজেকে খুলে বসেই আছে। কান ভেঙে মন বিগড়ে আকাশ
পাতাল সবই বয়ে যায়। ছাতে উঠে আসছে একতলার কোলাহল
মাটি ফুঁড়ে গ্যালাক্সির ডুব সাঁতার আর তুমি ভাবছ এখনও কেন
ঘণ্টা পড়ল না খাতায়। সারাদিন উড়বে উড়বে করেও কিতাবে
ডানা চমকায় না। আকাশ বরাবর যে দড়ি টাঙানো
তাতে হাওয়াই শুকচ্ছে নিজের অবাস্তব। ভুল অ্যাতো
লম্বা যে মাপেই আঁটছে না। দুদিকের দরজাই খুলে
রাখা আর তাতেই হারিয়ে যাচ্ছে ঘর। চলো হাতে হাতে
তাস বাটি, গল্প করি চনমনে তুরুপের। এবার
নিশ্চয়ই কপাল খুলবে আকাশের। মহাকাশের ছাতার
তলায় একটা গান পৃথিবী দুলে উঠবে শূন্য দোলনায়
আর অজস্র সরল রেখায় রংদার হবে বাচ্চা দুনিয়ার
নতুন টি-সার্ট।

আজকের পাঠ

চারদিক ফুটেই আছে, চোখ ফুটলেই ফেস্টুন টাঙিয়ে সূর্য উঠবে।
কোলাহল জুড়ে নাগরিক ওঠানামার ইতিহাস। শিরা ফোলা
হাতের ক্রোধ ও অপ্রকাশিত মুখগুলো দেখা যাবে। বিচ্যুতি
সমেত একটা গোটা তোমাকে যারা লুফে নিচ্ছে তারাই তো
লম্বা ড্যাস! ফুলস্টপ লোফালুফি করো না। কত
ঊনজন্মানো কচি সবুজ লাফাচ্ছে গ্লোবের দোলনায়।
তার চেয়ে বরং চলো একটা পুনর্জন্ম লিখি। একমুঠো
কাশ্মিরী মেঘ পাঠাই ওয়াশিংটনে। নালন্দার ভাঙা
ইটের নিচে বসে পড়ি আজকের পাঠ। সেলুলার জেলের
ফাঁকা সেল খুলে খুলে পড়ি। খুলে পড়ি নিজের সিলেবাস,
খুলি ও করোটি।

স্পর্ধা

লহরী (বড়াল) চক্রবর্তী

দুঃসহ স্পর্ধা দেখিয়ে ক্ষমতার অলিন্দে
প্রবেশ করার সাহস আছে?
সুস্থ মানসিকতার মানসিক লড়াই-এ
বুদ্ধির চেতনার সঙ্গে নিঃশব্দ বিরোধ,
দৈনন্দিন কাজের জগৎ,
ভালোবাসার জগৎ
পরিবারের প্রতিটি মানুষের দ্বন্দ্ব এড়িয়ে,
লক্ষ্যে পৌঁছনোর ক্ষমতার স্পর্ধা
দেখাতে হবে, ঘরে বাইরে প্রতি মুহূর্তে—

তবেই জয়ী হতে পারা জীবনে,
ক্ষমতার চূড়ায় নিত্য আরোহণ
আর পিছনে নীচে নামার টানে
অহোরহ যন্ত্রণার নিম্নচাপ।
ক্ষমতার অলিন্দে রক্তস্রোতের তীব্রতা,
মানসিক শক্তির ইচ্ছের সাফল্যের
স্পর্ধা দেখিয়ে, ক্ষমতার অলিন্দে
প্রবেশ করার সাহস আছে?
মনটা তো ডাস্টবিন নয়।

কাশীনাথ দাশ চাকলাদার-এর তিনটি কবিতা

মেঘমল্লার

গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চিকচিক
করছে সোনালী চাঁদ। খালি হাতে, পেঁজা
তুলোর পাহাড়। খালি হাতে, তুলো নিয়ে
পৃথিবীর রঙ দেখতে পাচ্ছ। তাই তো,

তোমার নাম দিলাম মেঘমল্লার। ভরা
শরীরে মেঘের আনাগোনা। তুমি যেমন
পৃথিবীকে দেখ, আমি তেমন দেখতে
পাচ্ছি কই? হাতের ফাঁকে ঢুকে পড়েছে

আকাশ। এইমাত্র বৃষ্টি হয়ে গেল। অনেক
রকম সবুজের রঙ মিশে মাঝ বরাবর
আলো চাইতেই পেয়ে গেলে অশান্ত প্রকৃতি।
সবাই কিন্তু পেল বৃষ্টির প্রলেপ।

শরীর থেকে বইছে ঘাম। প্রাণ আছে তো।

পা

যে চলে যায় তার শুধু পায়ের ছাপ
পড়ে থাকে। শরীরটা উবে যায়। মাটির
ঘ্রাণ অকল্পনীয়। এরকম ছুঁতে
ছুঁতে ভালোবাসা এঁটে থাকে। পায়ের তলা

শুধু মাটিকেই ভালোবাসে। চেনা মুখের
সন্ধানে এগোতে থাকে পা। নিরুপায়
হয়ে অজানা পথের সন্ধানে। সে জানে,
সামনের পথ অতীব দুর্গম।

তবুও পথ খোঁজার নতুন আনন্দে
উৎসাহ পায়। সামনে এগোতে এগোতে
পায় না পথের সন্ধান। তাকিয়ে দেখে,
পায়ে সেঁটে আছে মুখোশ। আসলে

আমাদের পায়ের আবডালে আর এক
মুখোশ খেলা করে। সে শুধু এঁকে রাখে
জলছবি।

সন্ধান

আমার দু'চোখে যা কিছু সুন্দর
সব তোমারই দেয়া। এতদিন তো
তুমি অন্তর্বাস কাটিয়ে এসেছ।
বর্ষার স্রোত কাটিয়ে এসেছ

হিমেল পরশ মেখে। আনন্দে ভরে
গেছে মাঠ। যত ক্লান্তি সব মরে
গেছে। চোখের সুন্দরে দেখি এক
অনন্য মানুষ। মাটির গভীরে

লুকিয়ে থাকে আর এক অন্তর্বাস।
কেমন আশ্চর্য তার প্রকাশ ঘটে।
কেমনে আশ্চর্য তার প্রাণের প্রকাশ।
কেমনে আশ্চর্য তার হৃদয়ের

ধুকপুক, এটাই বুঝি তার প্রাণের
নির্যাস বুঝি।

চার টুকরো

রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়

১
তুমি যার কাঁধে হাত রেখেছো
দেখো
তার কাঁধে
আর কারো হাত
২
গলা কেটে
কিছুটা রক্ত ছড়িয়ে দিয়েছি সারা গায়
মাথার কি দাম আছে বলো?

দেহটা বিকিয়ে যাবে
ক্ষুধার্তের অনুগ্রহ পেলে।
৩
একদিন
মানুষের করতলগত
এই পৃথিবীর প্রচ্ছদে
লেখা হবে ঃ
নির্বাচিত মেধার সংকলন
৪
গুণগত পরিবর্তন কিছুই হল না
সেই ভয়, সেই হিংসা
সেই অবিশ্বাস

শুধু কিছু অক্ষর সাজিয়ে বসে আছি

পরস্পর
ফিসফাস শব্দ বিনিময়
ক্রমশ বিস্তৃত হয়
হাততোলা বিচ্ছিন্ন জনপদ

শিল্পী : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্যাপ্তি

স্বর্ণালী দে সোম

তখন সবে পনেরো
মোহার্ত প্রেম ছুঁয়েছিল আমায়,
আজও মনে আছে লাল পলাশের রং মেখেছিল বসন্ত
নির্দয় পাথরে প্রেম লিখেছিলাম।

জীবন্ত আগ্নেয়গিরির আগুন উঠতে দেখেছি আমি
কখনও দেখেছিলাম সমুদ্রের আছড়ে পড়া স্রোত

বসন্ত পেরিয়ে গেছে অর্ধ যুগ আগে
অবুঝ প্রেম তবু আজও দীপ্তমান।

নিঃসঙ্গতা

অদিতি ব্যানার্জি

গোধূলিময় পার্বনের শেষ বেলা
যখন দেখি পাখীর দলের কণ্ঠস্বর
অতীব শান্ত হয়ে ওঠে
তখন বুঝি, পৃথিবীর নির্জনতাকে সঙ্গী করেছে
বেলা শেষ। তবে শেষ নয় অনেক আশা,
নিরাশাজনক ভাবনা
তবে...এখনও কী অনেক কিছু বাকি?
হ্যাঁ। তাই তো! কলমের পারে বাকি
এখনও অঢেল অলিখিত চিন্তা
ডায়েরী বন্দী অনেক ভাবনা। কষ্ট। যন্ত্রণা।
প্রকাশ্য জলের বিন্দুময় আশ্বাস যেন
মগজের কল্পিত ছায়ার মতো।
তবে নিঃসঙ্গতা, সেটা কী?
তুলোর রূপময় মনের সঙ্গপারে উপস্থিত
অনিচ্ছার মূল
সেই তো নিঃসঙ্গতা।

সময়ের অন্ধকারে

পিণাকীরঞ্জন গুহ

আমাকে কেন যে দিলে সুরভিত গোলাপের দিন,
যেখানে বুকের স্বপ্ন আলস্যের নিদ্রায় বিলীন।
সময়ের অন্ধকারে অতি শ্রান্ত অনেকপ্রহর—
অবিরাম নাড়া দেয় সদ্য কোনো প্রসূতির ঘর।
দেহলীতে অশরীরি পুরাতন দিনের খবর,
আগামীর গুনগুন গর্ভিনীর ভ্রূণের ভিতর।

গোলাপী গোলাপ তবু আমাকেই বেছে বেছে দিলে!
স্বপ্নের পাহারাদার বুঝি কেউ নেই এ নিখিলে?
চোখের সামনে কেন অনর্থক ঈশ্বরের ভিড়,
মনের ভিতরে আছে নমনীয় নারীর শরীর।

সুখের চুমুকে শুধু গণিকার বিষটুকু নিয়ে—
তামাদি ঋণের বোঝা একবারে দিয়েছি নামিয়ে।

এবার আমাকে দাও রাতজাগা প্রসূতির প্রহরীর ভার;
ভিতর-দুয়ার থেকে খুব কিছু দূরে নয় বাহির-দুয়ার।

তুল্যমূল্য

সমীর বেতাল

একটা বাড়ীর পিছনে
আরও বেশ কয়েকটা ঘিঞ্জি বাড়ী
হাওয়া কম, আলো কম
শব্দ কম
কমেরা সবসময়
কমের কথাই বলে।

সামনের বাড়ীটা বহুতল
হাওয়ার গতি বেশি, আলোর ঝলকানি বেশি
মানুষের সমাগম আরও বেশি
বেশিরা সবসময়
বেশির কথাই বলে।

শ্বেতপাথর

দেবীস্মিতা দেব

প্রথম থেকে আজ অবধি
অনেক নুড়ি জমিয়ে গেছি আমি।
একেকটা নুড়ির দিয়ে গেছি
একেক রকম নাম।
কোনোটার নাম দিয়েছি সুখ কোনোটার দুঃখ
কোনোটার হাসি কোনোটার কান্না
কোনোটার লাভ কোনোটার লোকসান
কোনোটার পাওয়া কোনোটার না পাওয়া
কোনোটার মৃত্যু কোনোটার বেঁচে থাকা।

এভাবেই—
এভাবেই নুড়ি পাথর
জমা করে করে
থাকবার জন্যে এক
বাসস্থান গড়েছি আমি।
আমার বসতবাড়ি।
বাড়িটার প্রতিটা টুকরোয়
জমে আছে এইসব নামধারী পাথরেরা।
সব অনুভূতির রঙে রঙ মেশানো
আমার এই পাথরখচিত বাড়ির
নাম রেখেছি—
শ্বেতপাথর।

নদী হবি তুই?

নিত্যানন্দ পাল

আজ যদি কবিতারা গাছ হয়ে ওঠে
ডালে ডালে সবুজ পাতা ভরে যায়
খাঁ খাঁ প্রান্তর ভরে যাবে সবুজে সবুজে।

আজ তোকে ছুঁয়ে দেই যদি
তবে কি তুই হয়ে যাবি নদী?
যদি তুই নদী হয়ে যাস
যদি তুই আমায় ছুঁয়ে যাস—
ভেসে আসা খড়, কুটো সব,
সব মেখে নেব এই দেহে।

ভেসে আসা মেঘ
যদি কবিতায় নেমে আসে
তবে সেই কবিতার মেঘে ভেসে
তোর কাছে যাবো।
ছুঁয়ে দেব তোর শরীর।
তখনও তুই তো নদী,
তোর ছোঁয়ায় ভরে যাবে মাঠ-ঘাট
খাঁ খাঁ প্রান্তর ভরে যাবে সবুজে।
সবুজ কবিতায় মিশে রব
তুই আর আমি
এক সবুজ পৃথিবী হবো।

অনুপকুমার আচার্য-এর তিনটি কবিতা

টাকা

স্নেহের চোখে জল—
ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, দাও;

ভালোবাসা পোশাক বদলে এসেছে
ইনিয়ে বিনিয়ে তুলল, কড়িখেলার গল্প...

গন্ধ নয়, শব্দের ভাষায়
প্রেম শোনাল বিনিময়ের ইতিকথা;

সম্ভ্রমের আসনে ধুলো—
নির্বাক চেয়ে থাকাই তার নিয়তি...

মুখ ফসকে অসতর্ক গুলির মতো
বেরিয়ে এল একটাই শব্দ : টাকা!

পুরুষ তুমি

আমার গেলাসের পানীয়
চল্‌কে পড়ুক
দৃষ্টিক্ষেপ করো না, পুরুষ তুমি!

আমার বাহুলতায় ভুলে
বসুক ভ্রমর
মৌন থাকো হে ব্রতী পুরুষ!

আমার স্তনাগ্রে যদিবা
স্থিত মধুকর
অচঞ্চল থেকো তবু, পুরুষ তুমি!

আমার নাভিমূলে কখনও মুগ্ধ
প্রজাপতি
স্থৈর্যহীন হয়ো না, পুরুষ-প্রবর!

আমার ঊরুসন্ধিতে যদি
মত্ত শ্বাপদ
উদ্দন্ড হও, হে পুরুষ তুমি!

সময়ের অন্ধকারে
পিণাকীরঞ্জন গুহ

আমাকে কেন যে দিলে সুরভিত গোলাপের দিন,
যেখানে বুকের স্বপ্ন আলস্যের নিদ্রায় বিলীন।
সময়ের অন্ধকারে অতি শ্রান্ত অনেকপ্রহর—
অবিরাম নাড়া দেয় সদ্য কোনো প্রসূতির ঘর।
দেহলীতে অশরীরি পুরাতন দিনের খবর,
আগামীর গুনগুন গর্ভিনীর ভ্রূণের ভিতর।

গোলাপী গোলাপ তবু আমাকেই বেছে বেছে দিলে!
স্বপ্নের পাহারাদার বুঝি কেউ নেই এ নিখিলে?
চোখের সামনে কেন অনর্থক ঈশ্বরের ভিড়,
মনের ভিতরে আছে নমনীয় নারীর শরীর।

সুখের চুমুকে শুধু গণিকার বিষটুকু নিয়ে—
তামাদি ঋণের বোঝা একবারে দিয়েছি নামিয়ে।

এবার আমাকে দাও রাতজাগা প্রসূতির প্রহরীর ভার;
ভিতর-দুয়ার থেকে খুব কিছু দূরে নয় বাহির-দুয়ার।

তুল্যমূল্য
সমীর বেতাল

একটা বাড়ীর পিছনে
আরও বেশ কয়েকটা ঘিঞ্জি বাড়ী
হাওয়া কম, আলো কম
শব্দ কম
কমেরা সবসময়
কমের কথাই বলে।

সামনের বাড়ীটা বহুতল
হাওয়ার গতি বেশি, আলোর ঝলকানি বেশি
মানুষের সমাগম আরও বেশি
বেশিরা সবসময়
বেশির কথাই বলে।

প্রহরী

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

আইন আক্ষরিক অর্থে বাঁধন
তোমার কাছে যেতে পারেনি
অভিমানে সন্দেশ বেড়েছে কেবল
সৌজন্যবশেই বলেনি কখনও
নিরাপত্তা দিতে পাখি হয়ে
উড়ে বেড়াই কাঁটাতারে
ধু ধু মাঠে অনুপ্রবেশের দরজায় নজর
উপরের চাপে হাঁসফাঁস করি সারারাত
তবু আছি, শুধু নেই তুমি,
এপার ওপারের মানুষের আকুলতার
ভেতরে চোরাস্রোত।
ভোরের আলোয় সুনসান মাঠে
ক্লান্ত রাত রোদ মাখে।
দু-খণ্ডের প্রহরীর দিনরাত কাটে
দুচোখের মণিতে।
পাখি গান গায় বিষাদের।

সন্ধ্যার বর্ণমালা

কনিকা চট্টরাজ

র-এ রা খুঁজতে দেখি রাঢ়ভূমি
রাইকে খুঁজিনি
গোধূলি আকাশ বর্ণ লাল
রা-এ ঘরে ফেরে রাখাল
আ-এ আ-মরি বাঙলা আমার
আ-এ আমোদিত ফসলের গন্ধে মাঠঘাট
আ-এ আলস্যে কাটানো বর্ষাদিন
আ-এ আমানি আকাশ
বর্ষার রিমঝিম
মা-এ মাতৃভূমি
অস্তিত্বে জড়িয়ে থাকো মা
মা-এ মাতাল মহুয়া চেনে
মা-এ মাদারিকা খেল
মা-জন্মের পর প্রথম উচ্চারণ
শ্লেটের বুকে মায়ের লেখা অ
ধাপে ধাপে তারপর
এখন সন্ধ্যারাগ
চলো সূর্যাস্ত পেরিয়ে যাই...

দেবাশিস কুণ্ডুর দুটি কবিতা

ইস্কুল - ১

একটি ভবঘুরে জলবিন্দু আমার পরীক্ষা নেবে,
একটি মুখ-ভার মেঘও...
হায়,
আমি কী শিখেছি?!
বসতে গিয়ে বেঞ্চটা বুকের হাড়ের মত নড়ে উঠল!
জল-ভরা চোখে খাতা-বাড়ানো হাত এগিয়ে আসতে,
মনে হল,
মাত্র কয়েকটা শব্দে সমস্ত পাঠ্যক্রম ধরা আছে।

ইস্কুল - ২

পাতায় পাতায় নোংরা পোকা কিলবিল করছে
—আমি ইতিহাস লিখে চলেছি;
আমার মাথা কাজ করছে না।
স্যার বললেন—মাথা কেটে নেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
আমি বললাম—তা কি অব্যর্থ!
প্রথমে চোখ বড় করলেন, তারপর ছোট;
তারপর সেখানে করুণ হাসি এনে বললেন—
সময় নষ্ট হচ্ছে, যেভাবে পার লেখ...
আমার জেগে থাকা মাথা দিয়ে
কলম আবার শক্ত করে ধরলাম।
কিন্তু এ পাতাগুলো যে... আহ্...
আমার একটা ঘুমিয়ে পড়া মাথা,
একটা স্বপ্ন দেখা মাথাও দরকার।

মোহনামুখী

সব্যসাচী হাজরা

দ্বীপ বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ছিন্ন আমরা থাবার রূপকার
মোহনামুখী মানুষ যথাসম্ভব হর্ন মেরে দেয়
আপনার গীতাপাঠে
তৈরি হয় মাথানুরূপ পিতা মাতানুরূপ নম্রভাঙা তারায়
রূপসম সুদূরূপ সম তৎকালীন পাখি ওগো আপদকালে এসো
লিঙ্গপুরাণে যথাসম্ভব পতাকা তুলে মোহনামুখী মৌ
এসো ছিন্ন করি দ্বীপের থাবা

পাঁচপাখি উড়ে গেলে থামা মাথা দিয়ে গড়ে নেওয়া গীতা
মাতানুরূপ
হর্নের রূপকার আমি ব্রেকের পর পর সময় খুলে দিই
হাওয়া খুলে দিই
আমরা হাওয়াজীবী তৎকালীন পাখিতে খুঁজে পাই
ধারে মাপা সানি
সূর্যের সানি সূর্যের নিশা
খুঁজে পাই তৎপুরুষে অঘোর
ঈশান
ও সদ্যজাত বামদেব...

বুদ্‌বুদ্‌

স্বাগতা মুখোপাধ্যায়

দু'হাত ভর্তি বীজ
রোপিত হচ্ছে সযত্নে
এই পর্যন্ত বেশ লাগছিল
তারপর...
আকাশে কালো মেঘ
বৃষ্টি কাঁধে মাথা তোলে সবুজ ফসল
সবুজ সোনালী হল নবান্ন সুবাসে
স্বপ্নের মতো সব সরে সরে যায়
স্বপ্ন ছবিরা সব বুদ্‌বুদ্‌ নাকি?
ঘোর ভেঙে দেখি
আমি,
ঊষর জমিতে বসে আছি।

জীবন কি...

সুনীলকুমার দত্ত

জীবন কি কিছু চলমান মুহূর্ত,
অনন্ত সময়ের প্রবাহে
ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া মোমের মত?
তোমার চিন্তা, তোমার ভাবনাগুলি,
সব শেষ হয়ে যাবে কি এক মুষ্ঠি চিতাভস্মে?

হয়ত শেষ বলে কিছু নেই
শেষ থেকে আবার শুরু হবে।

তবে কেন এত ছোটো এ জীবন!
কত জিনিষ দেখা হল না,
কত জিনিষ জানা হল না,
তবু চলে যেতে হয়!
জীবন কি শুধু চাওয়া-পাওয়া,
নাকি আরো বেশি কিছু!
নাকি অনন্ত সময় প্রবাহে
দাঁড়িয়ে, সময়কে জয় করা?

আরও ড্রামাটিক

চিত্তরঞ্জন হীরা

একেবারে নতুন ব্যাকটেরিয়া ঢঙের মুগ্ধতা
হেসে উঠে মুচকি দেয়
নদীর হালফিল জুড়তে জুড়তে প্রতিদিন ডিনারে
চাঁদের ও মুখ আলফানসো
আরও ড্রামাটিক...

পরত লেগেছে আট মাত্রা আমজনতায়
হুহুকে বোঝাতে পারি না—
এখন আর নদী নয়, স্রোতের দুমুখে
অন্তরীক্ষের একটা জীবন কীভাবে
তরজমা করে রাখে হাহাকে, সেটাই দেখছি।

বিজনের আলো
একটা একটা করে তাস তুলে নিচ্ছে ছুটে ছুটে
দলছুটের দাহ থেকে, মৌন থেকে...

উত্তর দাও

রোশ্নি গাঙ্গুলী

হঠাৎই একদিন চোখ মেলে দেখি
আমারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে মাতৃজঠরে থাকা ছোট্ট শিশু
জানি না সে কন্যা সন্তান নাকি বালক,
যেন দেশলাই-এর উপর পারদ; এখনই জ্বলে উঠবে।
অঙ্গুলি তুলে সে বলছে, আমি কে,
সে তো তোমার অজানা নয়
আমি কি তোমার অর্ধেক পৃথিবী ছিলাম না?
নাকি ডোবা জাহাজের মত সেদিন তুমিও আমার
রক্তগন্ধে তলিয়ে যাচ্ছিলে? উত্তর দাও।

আমি তো তোমাকে প্রাণের সৃষ্টি ঘটাতে বলেছিলাম
বলেছিলাম; নতুন প্রজন্মের হাত ধরে বিবেকের
মৌন মিছিল গড়তে। তাহলে এ তুমি কেমন মা?
আমি তোমার শরীরের শস্য ছিলাম
বীজ তো তুমি রোপণ করেছিলে
তবে কেন কুঁকড়িয়ে মেরেছিলে, উত্তর দাও।
আলোকবর্ষ পেরিয়ে আমি তোমাতে হয়েছিলাম স্নান
মেতেছিলাম তোমার মাতৃসুধার মহোৎসবে।
তবে কি সেদিন তুমি বন্দী হয়েছিলে বিবেকের কাছে,
আকাশচুম্বি উদ্বেগ, ইচ্ছেমরণের জয়রথে হয়েছিলে সাথী?

হে জননী তবে কিসের দ্বিধায় সেদিন
তুমি তোমার শিকড় ছিঁড়ে হয়েছিলে সন্তানহীনা?
তুমি তো আদি শক্তি, তুমি তো স্বয়ং-সিদ্ধা;
ঝড়, বিদ্যুৎ, তবে কেন সেদিন পৌরুষের পুরুষত্বে
বৃষ্টি ঝরালে না? উত্তর দাও।

মা আমার

তিস্তা বেজ

মা আমার পল্লীমেয়ে
মা আমার স্নেহের আঁচল
মা আমার নারায়ণী
দু'চোখ জল ছলছল

মা আমার ঘুমপাড়ানি
মা আমার কামতাবাড়ি
মা আমার শীতের কাঁথা
টিয়া রঙ তাঁতের শাড়ি

মা আমার নিঝুম দুপুর
মা আমার ধানের মরাই
মা আমার পুণ্যিপুকুর
দু'হাতে তাইতো জড়াই

মা আমার কুমির-ডাঙা
মা আমার হেঁসেল, হাঁড়ি
মা আমার বর্ষা রাতের
রূপকথা শুক ও শারি

মা আমার কল্মি-লতা
মা আমার সন্ধ্যাতারা
মা আমার একতারা সুর
বাউলের কণ্ঠে ভরা

মা আমার মন্দভালো
মা আমার কান্নাহাসি
আ-মরি বাংলা ভাষা
তোমাকেই ভালোবাসি।

অভিমানীনি

সুনীল মুখোপাধ্যায়

আজ সকালে এক আকাশ রোদ
ছড়িয়ে পড়েছে চুলে।
তোমার ঐ একঢাল কালো চুল
যেন একঢাল মেঘ হয়ে—
সকালের নরম রোদকে আড়াল করছে।
তোমার ঐ শিশির ধোয়া চোখে
কেন জলের রেখার আঁকিবুকি?
অভিমান থমকে আছে, তোমার ঠোঁটে,
তোমার মনের তল পাই না আমি।
মন নদীতে ডুব দিয়ে দেখি
কোথায় আছে মনমুকুতা—
যার ছোঁয়ায় তুমি আবার হবে
নরম রোদ,
আর আমি হবো বৃষ্টি...।

রাজধর্ম

মানিকচন্দ্র কর্মকার

সঞ্জয় নয়, এ যে ধৃতরাষ্ট্রের
বন্ধ-দুষ্ট দুটি চোখ, আপ্রাণ চায়
আপন পুত্রের জয়, আর স্বেচ্ছা অন্ধ মাতা
সে যে কি চায় অজানা নিশ্চয়।
দোষ পাপ, কিসের পাপ সঞ্জয়?
বল তুমি এ যে রাজধর্ম, শুধু রাজ্য জয়
খুন-জখম-মৃত্যু-ধন-সম্পদ, আরো
যা কিছু আছে কুপথের পথে...
রাজধর্ম টান-টান সেতারের মত
তুলে ঝঙ্কার এলোমেলো, আমি চাই
আপ্রাণ চাই আপন পুত্রের জয়।
ভালো করে দেখ সঞ্জয় শত পুত্রের জয়োল্লাস
দিব্য চোখে ঘর থেকে দেখো সঞ্জয়
একে একে খসে যায় প্রাণ, চলে যায়
অমোঘ মৃত্যুলোকে। হলুদ পাতার মত
খসে যায় টুপ-টাপ ধরনীর বুকে।

তোমার দেবতা কে প্রভু!
ডাক তাকে প্রাণভরে।
দেবতা-ঈশ্বর, বল কি সঞ্জয়?
রাজ-ধর্ম বীরত্ব, জয় পরাজয়
এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

মতিয়ার রহমান-এর তিনটি অনুকবিতা

ইচ্ছা

হব আমি হলুদ পাখি
বিকেলের
ফুল হব প্রশংসা কুড়াবো
সকলের
হব রোদ, বেড়া ভেঙে চলে
যাবো
সকাল হলেই তোর কাছে নিশ্চয়
পৌঁছাব।

অচেনা

এই নদী তোর নাম জানি না
ছুটছি তবু আমার পিছে
এই মেয়ে তোরে চিনি না
তবু কেন জ্বালাস মিছে।

তোমার জন্য

তোমার জন্য ভালোবাসা
আমার আতর আলো
দু'বাংলার মেল বন্ধন
লাগছে কি যে ভালো।
নইতো আমি অনন্যা
লিখতে পারি শব্দ
অনুতেই বিস্ফোরণ
বড়ো সবাই জব্দ!

অভিমান মৃত্যুহীন

অমিয়কুমার জানা

অভিমান রেখে মুছে দিলে নিজেকে
আমার ক্যানভাস থেকে
হয়ত আরও বেশি করে লালনের ভার দিয়ে গেলে
বলে গেলে ক্ষয়-ক্ষতের চাষাবাদের কথা
পশ্চিম যখন সূর্যের ইতি নিয়ে ব্যস্ত
তখন পূর্বে ঠাণ্ডা চাঁদ হয়ে ফুটে আছি হলদে রঙে
ঝাঁক বেঁধে নেমে আসা শিশিরে
দিয়েছি মাখিয়ে লতানে সিলভার রূপ
নিজের সর্বস্বটুকু দিনরাত একাকারে
বোঝাতে চেয়েছি তোমাকে চোখের
কয়েক ফোঁটা টাটকা জল অঝোর ধারায়
অভিমানে লুকোনো প্রেম নিটোলতায় উঠলে জেগে
সুখে সুখ ছয়লাপ—জীবনে জীবন—
চলে গিয়ে বুঝিয়ে দিলে মৃত্যুহীন তুমি
মৃত্যুর সত্যিই মৃত্যু নেই, হাহাকারের হাহাকার নেই

পুরান সেই

অম্বালিকা পাল চৌধুরী

চন্ডালিকা...

অন্ত্যজ মেয়েটি আরও অন্ধকারের দিকে যাবে
তারপর, কোনও একদিন
রাতের কণ্ঠনালী ছিঁড়ে শোনা যাবে
কোনও প্রাগৈতিহাসিক শ্রমণের চিৎকার—
'একটু জল দাও, বড় তেষ্টা এই বুকে।'

চিত্রাঙ্গদা...

পুরুষ মজেছে
রমনীর পৌরুষে—
অগত্যা মানতেই হয়
'তৃষ্ণার শান্তি'।

শ্যামা...

পরস্ব অপহরণে দোষ নেই
যদি তা রাজানুগ্রহে হয়।
শুধু এক রাক্ষসীর তৃষ্ণা
বারবার গিলে খাবে তরতাজা প্রাণ।

বাল্মিকী প্রতিভা...

হয়ত ঠিক তখনই
উই-ঢিবি ভেঙে মানুষ বলে উঠবে—
'মা-নিষাদ'।

কিছু কথা

সুতপা মুখার্জি

মনের ভিতরেও আরও একটা মন
লুকিয়ে থাকে—
কিছু কথা, অলিখিত সংলাপ
গোপনে স্বপ্ন এঁকে যায়...

মুখোশের আড়ালে এবড়ো-খেবড়ো
মুখ-মণ্ডল,
তবু মনটাকে সাধনায় পাকা করে নিলে
নিজেকে অনেক হালকা মনে হয়
যেন বসন্তের 'নবরাগ'—
হাসি-খুশী কান্না
অদৃষ্টের লিখন,
তারি মাঝে-ভালোবাসা ফোটায় ফুল
চেনা-অচেনা-পথের বাঁকে।

পুরুষপ্রেমিক

প্রদীপকুমার পাইক

তুমি বরাবর কোনো পুরুষ চেয়েছিলে।
আর আমি ক্রমাগত প্রেমিক হতে চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত।
পুরুষালি ঢঙে আমি ভালোবাসতে পারিনি কোনোদিন।

পারিনি পুরানো ছাঁচে ফেলে নিজের খেয়ালখুশি
মতো তোমায় হাতের পুতুল করে তুলতে।
রতি রতি সোনা দিয়ে বাঁধানো সোনাঝুরি হারে
তোমার বুকের তিল ঢাকতে পারিনি।

ক্যানাবিসের নেশায় চুর হয়ে লালামাখা জিভ দিয়ে
লেহন করতে পারিনি তোমার কোমল গোপন
হাত রাখতে পারিনি বুকের, নাভির, উরুর সন্ধিতে
চাইনি শীৎকারের নেশায় বেহাগ
পারিনি করাতে বীর্য স্নান

সত্যি তোমার কাছে পুরুষ হতে পারিনি
তাই তুমি পুরুষ খোঁজ, আমি বরং প্রেমিক থাকি।

হারিয়ে গেলাম

রণিতা দাস

ভীড়ের মাঝে হারিয়ে গেছি
খুঁজছে না তো কেউ
সাত সমুদ্র মাঝে কেবল
হয়ে আছি ঢেউ।
হয়ে গেলাম তারা
আমায় খুঁজে খুঁজেই সারা
হারিয়ে গিয়েও রয়ে গেলাম
তোমার মনে ভরা
বলে গেলাম—ডেকে ডেকে যখন হবে সারা
তখন দেখ হৃদমাঝারে
আমার স্মৃতি ভরা।

শহর

শান্তা কর রায়

আমার শহর ভীরু দুর্বল চিত্রকলা
ফুটিয়ে তোলে নরম নালিশ
ইঙ্গিত আর অনুভূতি বেপরোয়া—

আমার শহর এড়িয়ে চলে পুড়িয়ে মারে
সজলতা মুখর বেলায় দ্বিধা ঢাকে
তীরেই থাকে কল্পনা মেঘ বালির খেয়া।

আমার শহর নিঃসঙ্গ আগুন পলাশ
ঝড়ের রাতে নিভিয়ে রাখে সকল বাতি
নদীর জলে রক্ত ঢালে শ্রাবণ ধারা
আমার শহর চর্চা বোঝে বাঁকা খেয়াল
পেটারীয় ধূসরতায় ব্যঙ্গ খোঁজে—
পুরোপুরি অ-গভীরতায় রপ্ত যারা।

আমার শহর ভীষণ অকূল প্রশ্ন ব্যাকুল
নরনারীর উচ্ছলতা শিল্প স্বভাব—
মেজাজ যেমন, অনুবাদেও অবুঝ ওরা
আমার শহর বাইশ বছর ব্যস্ত থাকে
প্রখর রোদে বুদ্ধি জ্বলে বিপুল তেজে
শিরায় শিরায় সংকট তার পাহাড় চূড়া।

মহাভোজ

প্রদীপ ভট্টাচার্য

আঁস্তাকুড়ে জমছে রোজ
ফেলে দেওয়া মহাভোজ—

পেয়েছে সেই খোঁজ

দুজন মানুষ
একটা কুকুর

কেউ বয়ে বেড়াচ্ছে
ধর্মের বিষ
কেউবা র‍্যাবিস্

দখল নিয়ে চলছে মহাযুদ্ধের মহড়া...

সম্পর্ক

প্রদীপ কবিরাজ

আমি কি থাকব চিরদিন
তোমার হৃদয় আকাশে?
রঙিন রঙ্গনা সত্যিচম্পা অথবা মন্দার
কিছুদিন থাকব মিথ্যা মেজাজে,
কিছুদিন তোমাদের বৃষ্টি হয়ে ধুয়ে দেব
কিছুদিন না হয় থাকব উষ্ণ উত্তাপে।

কিছুদিন না হয় মিথ্যা কথা বলব না,
খাব না অখাদ্য কুখাদ্য বেশ কিছুদিন
যদি রোদে ঢেকে মেঘ জমে যায়
বলব তখন রোদ্দুর আয় না কাছে আয়
বলব তখন ঘুম ছেঁকে নিক ভাঙা হাট
বলব তখন হাত ডুবিয়েছি ঢেউ টেনে নিক।

আমার দুপুর শেষ। বাইরে এসে দেখতে পাচ্ছি
বিকেলের ছোট্ট নীল মেঘ
তারার নৌকোয় চুমকী দুলছে
পাব না তোমাকে শান্তি খুঁজবো লক্ষ কোটি
আমাকে ছুঁয়ে শান্তি হাঁটবে বহুদূর
আমি তুমি হয়ে যাচ্ছি, তুমি হচ্ছো আমার,
শুধু আমার।

সতেজ প্রেম

কাঞ্চনকুমার রায়

নরম হাসি নোনতা জল
চোখ গড়িয়ে গাল ভেজায়
তোমার ঠোঁটে আমার ঠোঁট
সমাজ মরে লালজ্জায়।

চোখ তুললে পালকি ভাসে
চোখ নামালে প্রিয়ার মুখ,
একটু সবুর কর না মন
দুজনে দেখা হবে সম্মুখ।

বর্ষা এলেই গঙ্গা জল
গেরুয়া রঙিন, রঙিন সুখে,
সাগর জলের রূপসী ইলিশ
রমন করে নদীর বুকে।

কিরে, মন তুই, পাগল হবি?
না, অষ্টমীর কাস্তে চাঁদ,
আমি বলি কি, চেখে দেখ না
প্রিয়ার চোখের নোনতা স্বাদ।

ভুরুর নীচে উরু যখন
তোমার আমার শরশয্যা,
তখনও কুরুক্ষেত্র বাকি
প্রেম যে রে সব সময় তাজা।

সুমন্ত ভৌমিক-এর দুটি কবিতা

পুষ্পাঞ্জলি

ভোরের দমকা হাওয়া এসে জানালো আজ বাসন্তী পঞ্চমী,
তোর স্নিগ্ধ হিমেল স্পর্শ, বলছে আজ সরস্বতী পুজো।
স্কুল পালানো ছেলেটি আজ স্কুলমুখো,
ভাঙা বাড়ির দালানে আঁকা নতুন হাতের আলপনা,
পাট ভাঙা হলদে শাড়িটা বলছে আজ সরস্বতী পুজো।
তোকে আজ খুব চেনা চেনা লাগছে, একটু অন্যরকম চেনা
মনে হয়, তুই ছিলিস আমার গ্রামের ঠাকুর দালানে...
পুরনো বট তলায়, চেনা মন্দিরে।
তোর খোঁপায় লাগানো ফুল বলছে আজ সরস্বতী পুজো...
চল, আজ আবার হাজার বছর পরে দু'জনে একসঙ্গে বলি,
সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে...

ধর্ষণ

তিলোত্তমা এই শহরকে আমি ধর্ষণ করেছি।
হ্যাঁ, আমিই সেই শিক্ষিত ভদ্রবেশী শহুরে জীব,
যে, এই শহরের সঙ্গেই বেড়ে উঠেছি এতদিন...
একদিন যে আমায় আশ্রয় দিয়েছিল তাঁর কোলে,
আজ তাকেই বিক্ষত করছে আমার দানব সত্তা।
প্রেমের নামে আমি শুধুই মেতেছি আসঙ্গলিপ্সায়...
তবুও সে প্রতিবাদ করেনি, শুধু অলক্ষে ভিজেছে তাঁর আঁচল।
নিজের সুখের জন্য তাকে দিয়েছি অসহ্য মারণ যন্ত্রণা...
প্রতিদানে সে দিয়েছে মাথার ওপর ছাদ, আর পেটভরা ভাত।
তবুও আমার ক্ষুধার নিবৃত্তি নেই! আজও মধ্যরাতে,
এক অজানা বাসনায়, আমি থাবা বসাই তাঁর বুকে।
হ্যাঁ, আমি হত্যা করি আমার প্রেমিকা এই শহরকে, ক্ষণে ক্ষণে।
তবুও সে রোজ বেঁচে ওঠে... হয়তো আবার ভালোবাসবে বলে।

আবদুল্লাহ আল রিপন-এর দুটি কবিতা

এক সকাল

এই সকালে
কোল ভোরে তুলে নিয়ে গরম রোদ্দুর
এলো, এ কোন লজ্জাবতী মেঘ! —
বিজুরীর আঘাতে আঘাতে কালো ক্রন্দসী
অথচ কাঁদল না!
এ কেমন সকাল এলো আজ! —
এমন অনলে অনলে করেছে স্নান
যার কোনো পথ্য হয় না
এমন মাদক নিয়েছে শিরায়
যার কোনো চিহ্ন থাকে না!
কেউ জ্বলবে না
ভেজাবে না কেউ
কেউ জ্বলবে না
জ্বালাবে না কেউ।
হূল বিঁধল না, ফুটল না ফুল!
ঘুম ঘোরে জেগে আছে পরাগমধুপ!

মানুষের প্রেম নাকি ঘোর লাগা এমন সকাল। —
চোখের প্রান্ত হতে, যতদূর চলে গিয়ে
ফিরে আসে মনে
ততদূর চলে যাওয়া
পাঁজরের বুমেরাং হাড়।

ভিন্ন আকাশ

জলের ভেতর রং ছেড়ে দিল কে-বা!
আর তো ভাঙলো না জোড়া
আর যে লাগবে না জোড়া কোনোদিন!
ঘুম ভাঙলো কী! ভাঙবে না ঘুম বুঝি!

ঘুমের ভেতর আরও এক ঘুমের
ভেতর আরও এক ঘুমের ভেতর আরও এক,
আরও এক ঘুম ভেঙে গেলে, অনেক
ঘুমের ভেতর জেগে ওঠে মানুষ! উঠেছে?

কোনো এক নিদ্রিত সাপিনীর
কোনো এক প্রজাপতির খোলস খোলার শব্দ
শরীরের ঘুমের ভেতর
রজনীগন্ধার ফুটে উঠবার শব্দ এইসব
ঘুমন্ত হাওয়ার চালে ভায়োলিন ঢালে।
টকটকে গাঁদা সাদা শেফালি সবুজ জলপাই
একদেহে তুলে নেয় বিবর্ণ মাটির রং।
নদী আকাশ দিগন্তরেখা
ভিন্নতর এক রূপ নিয়ে জেগে ওঠে
দিগন্তের আকাশের নদীর ঘুমের ভেতর।
বকুলের ঘুমের সুযোগে, মধু তার
ঘাসের জিভের ওপর নেমে এলো।
কার পরানের মতো দুলে দুলে
দোলায় অন্ধকার, নিখিল বিশ্বকে!
মুগ্ধ হয়ে আছে ফুল, উপচানো সুরভিতে
ঢেউ ওঠে জলের দেহে সমুদ্রের অগোচরে,
থরথর করে নিখিলকুসুম, পায়নি নিখিল টের!
শিশিরের জল ফেটে যায়,
ঘুমের ভেতর কাঁটা দিয়ে ওঠা
চালকুমড়ার কাঁটার ছোঁয়ায়।
জানে না অন্ধকার, বোঝেনি শিশিরের জল
পায়নিতো টের চালকুমড়ার একটি কাঁটাও।—
এমন ঘুমে অন্ধকারের গায়ে লাগে ভয়, বিস্ময়ে
অন্ধকার কোনোদিন পেল না টের, পাবে না!

মেঘে ঢাকা তারা

সঞ্জয়কুমার মুখোপাধ্যায়

জীবন এক শব্দময় গতিময়তা
ঠিক যেন শব্দমালার খেলা,
আছে চঞ্চলতার উদ্দামতা
আর আছে স্থবিরতার নিস্তব্ধতা।

জীবন এক সফলতার নাম,
মহাকাশে রকেটে চাঁদের হাট।
কোথাও বিফলতার নামে,
পথের ধারে পড়ে থাকা ফুটপাত।

জীবনে দেখি ভালোবাসার প্লাবন,
আবার সাহেব বিবি গোলাম।
কোথাও স্বজনপোষণের ছায়া,
নিশ্চয়তা অনিশ্চয়তায় ঢাকা।

জীবন সুখ দুঃখের দাবার ছক,
সবাই ঘুঁটি সাজায় জিতবে বলে।
চাল শুধু থাকে নিয়তির হাতে,
কেউ জানে না এক চালে,
কখন হবে কিস্তিমাত।

আসলে জীবন মেঘে ঢাকা তারা,
কখনো দেখে কালবৈশাখীর সর্বহারা,
কখনো স্বর্ণালী রৌদ্রজ্জ্বল আনন্দমেলা
জীবন মানে মেঘে ঢাকা তারা।

তুমি কখন আসবে

সুকুমার হালদার

তুমি কখন আসবে?

পশ্চিমের আকাশ রক্তিম হয়েছে। ঘাসের মাথাগুলো হিমের রুপালি
স্পর্শে ঢেকে দিয়েছে। ও পাড়ার কৃষক রমণী শাঁখে ফু দিয়েছে।
কাক শেষ ডাকে জানান দিলো শীত নামছে। রেস্তোরাঁতে রেস্তোরাঁতে
বরফ ছাড়া ওয়াইন রেডি হচ্ছে। ওয়েলিংটনে শোয়েটার চাদরেরা
হাঁক পাড়ছে। ফুটপাথবাসীরা আগুন জ্বালাবার রসদ খুঁজছে।
বড় রাস্তার ধারে উলঙ্গ শিশু কি কবি সুকান্তকে ভাবছে?

তুমি কখন আসবে!
আমার জন্য শীত আর অপেক্ষা ভাবছে
আমার জন্য শীত আর অপেক্ষা, অপেক্ষা করছে!

আবাদজনিত

রুমা ঢ্যাং অধিকারী

আকাশের দূরত্বের মাঝে শুয়ে পড়ে আছে নদী
নীলসবুজের টানে গড়ে ওঠে যেসব সাঁকো
তার সাথে হৃদয় ঝুললে শূন্যতাও সংকেতময়

রাত হল। ঝিমিয়ে পড়ে মানুষের গ্রহজীবন।
নক্ষত্র মঞ্চায়িত।

যতটা মাটি দিয়ে আমরা গড়ি আল
তার অদূরে সীমা ও রেখার মধ্যে পুঁতে রাখি আবাদ
আর চাঁদের সুতো ধরে ঝুলে থাকা জ্যোৎস্নায়
আমাদের পুতুল ভবিতব্যতা পায়

হর্ন বাজালে একটা সাইকেলরিকশা বাধাবিহ্বল পেরিয়েছে
খবর হওয়ার আগে হেলমেট পরে
স্বঘোষিতভাবে বাঁচো।

রুদ্র-সাহেবের হিসেব-নিকেশ

সুনির্মল বসু

আমি এখন এই শহরে
এত উঁচুতে থাকি,
এখান থেকে তলার মাটি
একেবারে দেখাই যায় না।
সর্বক্ষণ আরদালী-কর্মচারীদের
সেলাম পাই।
পুত্র-কন্যা বিদেশে
সহধর্মিনী সতত-ই পার্টিতে ব্যস্ত,
আমাকে দেবার মত
তার হাতে সময় বেশি নেই।
এই আমার সাম্প্রতিক সাম্রাজ্য,
এই আমার বর্তমান দিনলিপি।
ইদানীং রাতে আমার ঘুম আসে না,
বুকের মধ্যে দিনে দিনে বাড়ছে
প্রবুদ্ধ অসুখ।

চোখ বন্ধ করলে দেখি—
আমাদের গ্রামের চালাঘর
সাঁকো-নদী পাখি-ডাকা সকাল
উদাসী শস্যক্ষেত্র।
আর, মনে পড়ে সুনয়নাকে
যে আমার জন্য অপেক্ষায় ছিল,
আমি তাকে একা রেখে এসেছি।
খুব ইচ্ছে করে স্যুট-টাই ছেড়ে
একবার সুনয়নার কাছে যাই।
নদীর কাছে সাঁকো-র পাশে দাঁড়াই,
তা' আর হয় না,
রুদ্র-সাহেবের পা মাটিতে পড়ে না।

জীবনে ওঠা-পড়ার হিসাব
আজ আর আমি মেলাতে পারি না।

শেষ সীমানায়

নিত্যানন্দ দাস

স্রোতস্বিনী অবগত নয় তার অভিমুখ
পাহাড়ি পথে নামে কল্লোল—
পূর্ণ যৌবনা উদ্দাম আর উচ্ছ্বাসের জলধারায়
কত দুঃখ-যন্ত্রণা ভরা মন
আত্মস্থ মানসিকতায় তার যাত্রাপথ
সমতলে জোয়ার-ভাটায় যে দিশাহারা
ব্যাকুলতায় মনপ্রাণ আচ্ছন্ন
অববাহিকায় সমুদ্র মিলনে সে হারায়
নিজস্বতায় আলাপন

একদিন যুগ-পরিবর্তনের ছায়ায়
ক্ষীণ প্রবাহে সে শীর্ণা নিরাশার প্রাণে
ক্লেদাক্ত মননে, স্রোতস্বিনী—
শেষ সীমানায় আর নিঃস্বতায়।

ফারজানা আহমেদ-এর দুটি কবিতা

আর কতোদিন

আর কবে কথা ফুটবে?
আর কবে জেগে উঠবো?
আর কতদিন তোমার সন্তানের খুনি তুমি?
আর কতদিন ভ্রুণ হত্যায় হাত হবে তোমার লাল বর্ণ?
আর কত মেয়ে ধর্ষিত হলে?
আর কত মেয়ে খুন হলে?
আর কত মেয়ে নির্যাতিত হয়ে আত্মহত্যা করলে?
আর কত অসহায় শিশু নিপীড়িত হলে?
আর কতদিন তোমাকে আমি খুনি বলবো না?
আর কতদিন তুমি মৌসুমী পাখি হয়ে উড়বে?
আর কত দেখেই যাবো?
যারা প্রাজ্ঞ, বিবেকবান তারা কোথায়?
যারা সমাজসেবা করেন তারা কোথায়?
কে বাজাবে বাঁশি,
বাঁশির সুরে কবে অমানুষ থেকে মানুষ হবে,
কবে শুষে নেবে কষ্টের সমস্ত কুহক?

কাঁটা তারের কাঁটার জাল

বন্ধু আমার সন্ধ্যে হলেই বাজায় বাঁশি
কাঁটাতাঁরের এপার থেকে আমি শুনি,
বন্ধু আমার বড়ই দুঃখী
খুঁজে শুধুই প্রাণের ছবি
হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলো
একটা দুটো গুণেই গেলো,
হৃদয় ছেঁড়া বাঁশিগুলো
ধূলো ঝেড়ে বাজিয়ে চলে!
হরেক রকম বাঁশিগুলো
প্রাণের সুরেই কান্না তোলে,

বন্ধু আমার এমনি একা
বিজন পথে লুটিয়ে থাকা,
ধূলো ঝেড়ে কেউ বলে না
মনের কথা বলো দেখি।
সকাল হলেই বন্ধু আমার
কাজের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে
সন্ধ্যে হলেই হিসেব নিকেশ
শূন্য ঘরে একলা বসে,
তিন পুরুষের জন্মভূমি
কেন এতো ভীষণ টানে!
কাঁটা তারের কাঁটার জালে
ভালোবাসা কেঁদে মরে।

ঠকগ্রস্ত জোলাদের পুরাতত্ত্ব

ত্রিস্তান আনন্দ

লোকাল পাখির ডানা ফসকে ঝরে পড়ে চালাক পালকের তাথৈ গুচ্ছ
গ্রাম্য কবির অজঅনুভব বিশ্বাসের শ্যাওলায় গড়ে তোলে সবুজিয়া মহাকাব্য
একদিন ফুটি ফেটে মধুসম্ভব পুঞ্জে পুঞ্জে বেরিয়ে আসে লবণাক্ত সত্যের ঢেকুর
ছিন্নমূল পৃথিবীতে কবিই শুধুবা অজ্ঞান কুষ্মাণ্ড
শিকড় ছড়ানোর মূর্খতা বুঝি কবিতার ডাকে বিলি করে কবি—

ফলিয়েছ পঙ্‌ক্তির বাঁশঝাড় রূপালি প্রজ্ঞার জোছনা কুড়বে
স্তবকের গুপ্ত টোনে বেজে ওঠে অপর বাঁশরীর নিধুবন
একবারও বোঝনি কি
আহা কবি
ছাই রেখে পুড়ে গেছ সবি।

অর্ধ-উজাগর

আশিসকুমার নন্দী

আজকাল মনে হয়—
পচনশীল কু-কল্পনা ঘেঁটে চলেছি,
অবিরাম নিরবচ্ছিন্ন কু-আশা নিয়ে
বিপথগামী আমার সবটুকু সততা।
কালান্তরের ঘূর্ণিপাকে—
জানি না জেগে আছি কিনা
আধোঘুম আধোবাঁচা!

পল্লব মজুমদার-এর দুটি কবিতা

নবীন নিকোটিন

নেহাতই ছেলেমানুষ তাই সহজে নিয়েছি সামলে!
পরিবর্তে রাখিনি কোনো প্রশ্ন, জবাবদিহি।
নির্বাক হয়ে ফিরে গেছি আর বুঝেছি বৃষ্টি নামলে,
চোখের জলের ঘনত্বটা মেঘেরই মতো মিহি।

ধরে নিলাম সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তর আমি প্রাণী;
পৃথিবীতে থাকি ভর্তুকিহীন সম্পর্কের স্বার্থে।
অধিকতর সুখের হদিস খুঁজে ফিরে সন্ধানী,
মানুষ থেকে রূপান্তরিত হয়েছি পদার্থে।

প্রতিলিপি ক্ষয়, সৌধ স্মারকও ভেঙে পড়ে রাজ্যতে!
বিবর্তনের ঠোঁট ছুঁয়ে যায় নবীন নিকোটিন।
আগুন নেহাতই প্রেম বর্তায় হৃদয় নামক দাহ্যতে,
দেশলাই হলে আত্মঘাতী, কাঠি শোধ করে তার ঋণ।
তাই,
রোজকার যত পথে পরিচিত, মোহগুলো দেখে চোখ এড়াই
পথ ভুলে আসা ছোঁয়া বা কুয়াশা পত্র-পাঠই ঘর ফেরাই।

জবাব

কালকে ভোরের উন্মাদনায় মুহূর্ত হবে দামী,
পশ্চাতে তাই প্রশ্ন যাহোক জবাবে হাসবো একগাল।
দস্তা খাতায় বস্তাপচা একক সালতামামি,
এই হিসাবের শেষ রাতে সব বিদায় দেবই জঞ্জাল।

আলসেমি মোড়া জড় জীব আমি, সংবেদনায় হুঁশ পাই।
মহাজাগতিক বিবস্ত্র কলকব্জায় পিষি চিন্তা।
চোখ খুলে সবই সাদাকালো দেখি, বন্ধ রাখলে রোশনাই!
গাছের ফাটলে সোহাগ জমালে পিঁপড়েরা বোঝে ঋণ তার।

বিবাদের কোনো সূত্র হয় না, হাত মিলে গেলে ফের জোট।
কি লাভ সে জয়ে যেখানে আত্মা প্রতিদ্বন্দ্বী আমারই!
'আমি কেন আছি' প্রশ্ন অনেক। পেশী স্থির রাখে ভিজে ঠোঁট
বোতামেরা যদি বিদ্রোহী হয়, সে দায় তো গোটা জামারই।

অপারেশন টেবিলে

প্রবীর সাহা

ইচ্ছা হয়
দুহাতে রোদ্দুর
মুঠো করে ধরি
তুষারের বল ছুঁড়ি
শীর্ণশয্যা দীর্ঘশ্বাস অস্থির
আর একবার
হে ঈশ্বর
বাইরে আসতে দাও
মুঠো করি
রোদ্দুর
যন্ত্রণা আর জীবন
পাশাপাশি
সরীসৃপ চেতনা বিষায়
মৃত্যুর আগে আরেকবার
ঘাসের বুকের পরে
বাঁচতে দাও
হে ঈশ্বর।

জলরঙে ভেজা চিঠি

ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়

জলরঙ মুছে দেয়
জলরঙ ছবি হয়
লেপটে থাকে বিরহ বিচ্ছেদ মৃত্যুশোক,
এইসব দেখে শুনে
উদাসী নীলকণ্ঠটা উড়ে গেল
পূব থেকে পশ্চিম দিগন্তের দিকে,
মজে যাওয়া গাঙের দিকে
একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে থাকলো গাঙচিল
জলরঙ মুছে দিলো রোজকার ওঠাবসা,
জলরঙ সজনে গাছের গোড়ায়
জলরঙ কৃষ্ণকলির কালো চোখে
ক্যানভাস জুড়ে স্বপ্নের হাবিজাবি।

প্রভাস ভদ্র-এর দুটি কবিতা

এসময়

তুমি আমি সে—সকলেই ভালো
অথচ নিয়ত
প্রিয় পরিচিত মৃত্যু শোক
কান্না জমে রাশিকৃত বরফ হলো
রক্তক্ষয়
দগ্ধ দুপুরের বিষণ্ণ ব্যথা
অনেকের অহঙ্কার...
এ সময় ভালোবাসার ভীষণ দরকার।

ছায়া কায়া নিঃশ্বাসে অবিশ্বাস
দ্বন্দ্বঃ
অরণ্যরীতি ছাড়ো।
সম্পর্কিত প্রাণের প্রীতি এখন স্মৃতি
নিঃসঙ্গ শূণ্যমন
তোমার আমার
এ সময় ভালোবাসার ভীষণ দরকার।

আমিও

ব্যতিক্রম আমি। অকৃতদার প্রিয় বন্ধুরা আমার
সাত দশ পনেরো কাঠার জমিদার
পুকুর ডোবা সব্জিবাগান,
নারকোল কলা সুপুরিবৃক্ষ ঘেরা
দু'তিন কামরা ঘরবাড়ি
এই নিয়ে জমিদারী।

অকৃতদার প্রিয় বন্ধুরা আমরা
সাত দশ পনেরো কাঠার জমিদার
খুশিতে টগবগ চনমনে মন
কেননা গর্বকথা ডুগডুগি বাজিয়ে বলার মতন
দেখা হলে, তুঙ্গে হাত বুক মাথা তুলে বলে—
প্রভাস, জমিঘরবাড়ি তোমারও করা দরকার
কেন?
'শেষ বয়সে দাঁড়াবে কোথায়?'
গাছতলায়!

জন্ম থেকেই গাছ হয়ে গাছের ছায়ায়
ইচ্ছে হলে হাত বাড়ালে
রূপোর চাঁদ সোনার সূর্য ছুঁতে পারি?
অন্য কিছু? মাটির গভীরে শক্ত ভিতে প্রথিত
প্রত্যয় আমার
ছায়া ছড়িয়ে বুকের নীচে
শস্য ফুল শক্ত ভিতের প্রার্থনায়
আমিও যে অন্ধকারে মাটিই খুঁড়ি।

শব্দে নিঃশব্দে

পল্লবকুমার চট্টোপাধ্যায়

সহজলভ্য জীবন হাঁটছে—তুষাগুনে পৃথিবী
একদিকে ভস্মের অঙ্গার
গন্ধ হারিয়ে নির্বীজ বসন্ত
স্বার্থসিদ্ধির যূপকাষ্ঠে গর্ভধারিনী
ঝোপে বেওয়ারিস শিশুর কান্না
বছর জুড়ে কালবোশেখ
ধর্মে আছড়ে বলিরেখা!
মন্দের গায়ে অদ্ভুত চুম্বকীয় শক্তি
তবু বুক বাঁধি—বাতাস বয় দিগ্বিদিকে
মহুয়ার মাদকতায় ঘুম আসুক
কাকের কর্কশ রব শুনি
নিঃশব্দের মৃত্যুর কথা শুধু—
হিমালয় মাথা তুললো বলেই
তার বোধের গভীরতা ছড়িয়ে সমুদ্রে
এও তো উচ্চতারই মাহাত্ম্য
ভীষণ সংকটে জয়ী পর্বত আরোহীর
বাঁশি ধ্বনি নীরবের পারাপারে
স্বপ্নের রাজকন্যা এভাবেই নামে নূপুরের শব্দে
নিঃশব্দের প্রতিধ্বনি শুনি যতবার!

সুদীপা সাহা-এর দুটি কবিতা

ছেড়ে গেলে

স্পর্শ ছেড়ে গেলেই পতন
সুখ ছেড়ে গেলে দুঃখ
মা ছেড়ে গেল যে সন্তানকে
সে অনাথ
অর্থ ছেড়ে গেলে দারিদ্র
বন্ধু ছেড়ে গেলে
জীবন থাকে না আর।

শূন্য আকাশে

খোলা ছাদের নীচে
একা, একা,
দীর্ঘ প্রতীক্ষায়।
ভিসা আসবে, আর আমি
এগোবো একটু একটু করে
শূন্য আকাশে।

কাকলি চট্টোপাধ্যায়-এর দুটি কবিতা

স্বপ্ন

স্বপ্ন যখন মাটির বুকে নামে,
খুশির বানে আত্মহারা আমি,
জীবন তখন বড্ড বেশি দামি।

স্বপ্ন যখন আধফোটা এক মুকুল,
মাছের চোখে লক্ষ্যভেদী আমি;
জীবন বুঝি জমকালো জামদানী।

স্বপ্ন যখন ঝড়ে আহত পাখি,
শ্রান্ত পায়ে শিকলি বাঁধা আমি;
জীবন সেদিন ভীষণ অভিমানী।

স্বপ্ন যখন আকাশ-কুসুম আঁকে,
দিশেহারা সৃষ্টিছাড়া আমি;
জীবন-সঁপি তোমায় অন্তর্যামী।

সন্ধ্যা আবেশ

এখনও কিছুটা পথ চলার আছে বাকি
সকালের শৈশব আলোর সোহাগে
চুপকথার গল্পেরা করছে ডাকাডাকি
এসো—হিয়ার মাঝে হিয়া ধরে রাখি।

রামধনু রঙ নিয়ে আকাশের
প্রজাপতি মেলে দিল পাখনা,
তোমার দুচোখে তার রক্তিম আভার
আবেশের রেশটুকু থাক না।

সন্ধ্যা নামায় জোনাকিরা আলো জ্বেলে জ্বেলে
নীরবতা ছেয়ে যায় রাতের গভীরে
আধো আলো-ছায়ায় স্বপ্নেরা কথা বলে...

...চলে যাওয়া সোজা নয়...

বাপি মহাপাত্র

চলে যাওয়া সোজা নয় জানি
তবু রয়ে যাওয়া সয় না।
বয়ে যাওয়া স্রোতে ভাসছি
আর রপ্তাচ্ছি সয়ে যাওয়ার,
নিঃসঙ্গতার শব্দে জেগে ওঠা
অচিন পাখির পাথর চাপা বুকে
জমে থাকা দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনছি।

চলে যাওয়া সোজা নয় মানি
তবু রয়ে যাওয়া যায় না।
বুড়ো বটে বেঁধে বাসা
উড়ে গেছি পরিধিতে
নাগালে নীল আকাশ,
আর এপারে ঘুঘুর ফাঁদ।
কিন্তু,
আবার ফিরেছি ব্যাসার্ধ বরাবর,
কারণ চলে যাওয়া সোজা নয়।

নেত্রপাত না করে

সনৎকুমার ঘোষ

বিসদৃশ্য সব দৃশ্যপট; চতুর পার্শ্ব চরিত্র,
মাঝখানে মগ্ন দ্বীপের মত জেগে আছে মনুষ্যকূল।
শুধু বর্তমান, মুহূর্ত; প্রতি মুহূর্তের অণুসমাবেশ।
ঊর্ধ্বরেতা দেবতার দেখা মেলে কদাচিত।
জিঘাংসা; ঈর্ষা, আদিমতা ছেয়ে থাকে অণুক্ষণ।
সৃষ্টিমূলে ছিল কি প্রেম, না জিঘাংসা?
প্রতিকূলতাকে পেরিয়েও এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও মেলেনি।
মগ্ন চরাচর, বিহ্বল ঊর্ধ্বলোক, নতজানু শ্রমনয়ণ।
ঈশ্বরের চরাচরে আপ্লুত হ্লাদিনী শক্তি
মায়াবী তমাচ্ছন্নতার ঘোরকে ছেদ করে
আত্মপ্রকাশ করবে একদিন স্বঃ প্রকাশের মত
এই আশায় জীবন্মৃত আছি।

সবার হবে

সত্যেন্দ্রনাথ নাইয়া

দানের চিঁড়ে, বিনিপয়সার জলে
সাধের কলজেটা...
সমাজ বদলের চোখে রক্তাল্পতা মিছিল,
থিয়েটারের গ্লাডিয়েটর তবুও দৃপ্ত,
রসহীন বুকফাটা অকালবৃদ্ধ খেজুরগাছ!
বলিহারি! সাবাস!
দাসব্যবস্থা কবেই মাটিচাপা ইতিহাস।
আকাল বোবা দাবানল, অদৃশ্য অন্তর্বাহী;
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বাকিটা চাপা নান্দনিক।
হও চিঁড়ে চ্যাপটা, পৃষ্ঠা ভরা স্তাবকতা
আজও ভোর কেটে পড়েছে
সকাল অগত্যা হাঁড়িকাটে,
দুধহীন বাঁট টিপে আশা বের করে,
পৃথিবীটা সবার হবে...

সুব্রত রুদ্র-এর দুটি কবিতা

শোক

যতবার হাঁসটিকে বড়ো করি
একটু একটু ক'রে খারাপ আবহাওয়ার আড়ালে
বুকের ওমে গরম রেখে—
অনন্ত আমার মধ্যে হাঁস মারে।

পুঁজির ভেতর আছে একটিমাত্র শ্লোক
অধিক শোকে শুদ্ধ হবে তপস্যার মন।

কালমেঘ গাছ

লেখায় যে জন মরে, ভগবান তার কী করে!
ছায়াকে একটুখানি পাওয়া আছে সবার জন্যে
কালমেঘ গাছের ছোট ছোট ঝোপের মধ্যে
কবিতা ছেড়ে চলে যাব
বহু দূরে কোথাও ছোট্ট হয়ে কালমেঘ গাছের ছায়ায়।

অলীক ভ্রমণ

শ্যামলকান্তি মজুমদার

পথে বেরিয়ে মনে হল হাঁটছি না
যাচ্ছি কোথায়?
চারপাশে পিছলে যাচ্ছে রোদ
পায়ের কাছে জবুথবু ছায়া

চোখে কার অদ্ভুত ইশারা
ফিস্ ফিস্ স্বরে কথা বলছে হাওয়া

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি নিরুদ্দেশ!

শান্ত রায়-এর তিনটি কবিতা

রঙ্গিলা

—অ্যাই, অ্যাই, গায়ে রঙ দিবি না! হি-হি, হি-হি...
কী করছিস? অ্যাই—একদম—! মাইরি, খুব খারাপ
হয়ে যাবে কিন্তু! হি-হি-হি...
শুধু আবির ওটা! যা-হ্! বুঝি না—না? মারব
এবার তোকে... অ্যাই, কী করছিস? খুব
খারাপ—একদম—তুই না একটি... আবার—
দেখাচ্ছি এবার, দাঁড়া! কী বললি? —অ্যাঁ? হি-হি-হি...
হি-হি-হি-হি... ছাড় বলছি...
উম্ম্ম্ম্...

গুপ্তকথা

বাউলের সঙ্গে মোলাকাত
কেঁন্দুলিতে, সতীমার থানে...
কভু দিন শুরু তারই গানে,
গানে ভরপুর চৈতিরাত।

গান-টসটসে বাউলের
জানি কি সব কথার মানে?
চেয়ে আছি দিগন্ত-পানে—
খপ ক'রে হাত দু'টো ধরে :

'ও কবি, জানো তো, আজকাল'
—বলল আমার কানে কানে,
'ডাকাতেরা রাজনীতি করে!'

কে আসল

ওকে ভালো চাল আনতে বলেছিস, সঙ্গে মুগের নাড়ু,
কলমিশাক, 'কেশকালা', মৌরি-বাদাম,
ধামা, কলসি, ফুলঝাড়ু, মাজন, সুগন্ধি তেল, টিপ;

অ্যান্টাসিড আনতে গিয়ে পাশাপাশি যেন কেনা হয়
দু'প্যাকেট ন্যাপকিন স্যানিটারী।
পেঁয়াজ, পাঁপড়, সুজি, পোস্ত, বেসন, বড়ি, চিঁড়ে-মুড়ি...; গামছাটা
থাক এবার, কিন্তু চাই
লাল-সবুজ ব্লাউজপিস দুটো,
দু'গজ সায়ার দড়ি...হ্যাঁ গো, মালপো আনবে নাকি
এক-আধ ডজন?' (চাপা হাসি)

অন্যজন কাছে এসে দু'হাতে জাপটে ধরে তোকে, তারপর...
ওর
অনুপস্থিতিতেই একে তুই ভাত বেড়ে, মাছ-মাংস যত্নে খাওয়াস;
অনেক-অনেক খাটে কিনা—

একজন ভাতকাপড় দেয়, আর অন্যজন তোর
মেটায় আরেক খিদে... তবে, ঠিক কোন্‌জন
তবে, কার? তুই তবে
আসল 'ভাতার'!
কতটুকু কার?

অনন্তের পথে

সুব্রত রায়চৌধুরী

শ্মশানের পথ চিনে চিনে
চলে এসেছি এতটা দূর
এখানেই তো ছিলে
নিশিডাকা ভোরে চলে গেলে তুমি
সেই থেকে খুঁজে খুঁজে
আমার বয়স গ্যাছে—

এইখানে এই সজনে তলায়
আমার মায়ের শোক
লেখা ছিল জলের অক্ষরে
নিশি ডাক শুনে এসে দেখি
আমার শোবার চিতা একটাও নেই আজ

আমার সূর্যাস্তে তবে
কোন ঘাটে ভেসে যাবে এই দেহ,
এই বয়স পোড়ানো ছাই
অনন্তের পথে...

হাতের গল্প

নমিতা চৌধুরী

ইদানিং আমার বাঁ-হাত ডান হাতের থেকে
কিছুটা লম্বা হয়ে গেছে
লুকিয়ে রাখলে কেউ জানতে পারে না
পোশাকটাও বদলে নিতে হয়েছে
একটু লম্বা হাতা দু একটা পকেট ইত্যাদি ইত্যাদি
আসলে লোকে না বুঝলে আমার তেমন অসুবিধে নেই
বরং সুবিধেই হয়েছে এই যেমন প্রয়োজনে
দু-একটা বাড়তি জিনিস সহজেই নাগালের মধ্যে
এসে যায়। কেউ টেরই পায় না
না ডান হাতটা আর লম্বা করতে চাই না
দিব্যি আছি, একটু সাবধানে একটু সমঝে চলতে হয়
আর ডান হাত বাঁ হাত, একসঙ্গে জুড়ে কিছু করায়
একটু ঝামেলা এই আর কি!
অবশ্য তার আর দরকারই বা কী!

মেহেক

অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাতাস জানে না হাওয়া
পাতাকুহকের নীচে, কত কি
গোপন রাখে, জানে মর্মর
ইশারায় বেসামাল খোলাচুলে
সন্ধ্যা ভাষায় কথা বলে, নিগূঢ়
নক্ষত্রালাপে জমে ওঠে হুঁকাশপ
ধোঁয়া মৌতাতে—পরাগুঞ্জন
চৈত্রের পৎঝর ঢেকে দেয়
বিবর্ণ শহর রঙছুপ চিহ্নপুরাণ
পতিত সড়কে একটি ঘূর্ণিপাতা
ধুলোস্নানে আহ্লাদ মাখে
দৃশ্যটি টেনে নেয় তামাম
ক্যামেরার চোখ নজরবন্দী
অছিলায়, বাতাস জানে না
হাওয়া, কীভাবে যে মেহেক ছড়ায়!

এই তো এলাম

জগন্ময় মজুমদার

কোনো মানে হয়, এই তো এলাম
আবার

দরজা মিথ্যে আওয়াজ দেয়
আলগা একটু হাওয়ায় হাসে
খিল।

যাই না বলেও যাই

সিঁড়ির নীচে হাই তুলছে মেনি
চারটে ছানা চোখ ফোটেনি
পাড়ার সবাই দূর ছাই করলেও
জন্ম মানে না

যাই না বলেও যাই
মেনি পর্দা তুলে হাত নাড়ছে।

শূন্যের তর্জমা

সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পা থেকে মাথা পর্যন্ত অপমানে সেজে আছো,
এমন সাজটি তো তোমাকেই মানায়!
ধোয়া তুলসীপাতা সময় বয়ে যাচ্ছে যথারীতি
এরই মধ্যে এসে পড়লো আমাদের গোধূলির উৎসব

পরিচয়হীন হয়ে আছো,
ও কিছু নয়, পোশাক তো আছে!
তাছাড়া বছর গুলোও ঢেকে রেখেছে আহত আত্মাটি

তবু কাশফুল এখনো জন্মায়
শুধু কেউ কেউ হারিয়ে গিয়েছে মনে পড়ে

মরুকাব্য

রফিক উল ইসলাম

দু-দুটো ঝলমলে পৃথিবী খুব অস্থির হয়ে আছে
তোমার বুকের ওপর। আমি মক্কার দিকে যাব,
নাকি মদিনার? খুরমা শাখা থেকে ছুটে আসা
অল্পস্বল্প হাওয়ায়
তিরতির করে কাঁপছে তীব্র বালিয়াড়ি। কখনো পুষ্করিণী ভেবে,
কখনো তৃষ্ণার পানি ভেবে ভ্রম হতে পারে। এরকমই কোনো
ভ্রমের ভিতর দিয়েই
আমি তোমার ওষ্ঠে সমাহিত আবে-জমজমের
হদিশ পেয়ে যাব।

আমারও একটা পৃথিবী রয়েছে নিজস্ব ঘূর্ণনে। রয়েছে অন্তঃস্থলে
গলিত লাভার উদ্‌গীরণ। তোমার দুটো পৃথিবী তাকে
হরণ করে রেখেছে! নৈঃশব্দে, সমাহিত আলোয়
আমি তোমার হিজাব-পরা চরাচর ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখি। আমার
জন্মান্তর ঘটে যায়। এরকমই কত-কত জন্মের তৃষ্ণার্ত ভ্রমণকথা
অনাবিষ্কৃত কোনো প্রাচীন গুহায়
অচেনা লিপিতে একদিন উৎকীর্ণ করে তুলব। তুমি শুধু
আমাকে প্রস্তুত করে দাও।

মরুঝড়ে মুখ-লুকানো কাফেলা থেকে দলছুট আমি, সহসা
তোমার জোড়া পৃথিবীর দিকে গড়িয়েছি। আমি কি
মক্কার দিকে যাব, নাকি মদিনার? আমি কি তোমার ওষ্ঠ খুঁড়ে
আবে-জমজমের সন্ধান পেয়ে যাব? জানি না কিছুই!
খুরমা শাখা থেকে ছুটে আসা প্রাজ্ঞ বাতাস, আমাকে শুধু
সেই অনাবিষ্কৃত গুহার
পথ চিনিয়ে দাও। তীব্র হলুদ বালিয়াড়ি মন্থন করে
যেখানে একদা অচেনা লিপিতে উৎকীর্ণ করে তুলব
রূপান্তরকামী এইসব মরুকাব্য।

কবি শ্রীমধুসূদন দত্ত

তেজেশ অধিকারী

কপোতাক্ষ, সাগরদাঁড়ী—এখন তোমরা কেমন আছো প্রিয়?
কলিকাতা, মাদ্রাজ? কেমন আছো গ্রেট ব্রিটেন, প্যারিস,
গ্রেজ ইন? ডিঙি নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ—নবীন পরম্পরা?
তুমি শ্রীমধুসূদন মাইকেল—রঙ্গলাল—হেমচন্দ্র বন্দ্যোঃ
খিদিরপুর কবিতীর্থ। হিন্দু এবং বিশপস কলেজ। চার্চ।
শিক্ষকতা-পত্রিকা-প্রেম-সন্তান, নাট্যশালা, সভা, কোর্ট,
কলেজস্ট্রিট—বৃহৎবঙ্গের মাটি—অনিঃশেষ বীজতলাঃ
'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে...মাতৃভাষা-রূপ খনি পূর্ণ মণিজালে।'
অভিজাত, বিলাসী, উদ্ভাবনী কবি-শিল্পী-যশোহর—
সাগরদাঁড়ি-জয়কৃষ্ণ পাঠাগার—উত্তরপাড়া নামীগ্রাম—
দাতব্য চিকিৎসালয়—পার্কস্ট্রিট সমাধি—এক আকাশ।
গঙ্গায় প্রণাম রাখলেই পৌঁছে যায় কপোতাক্ষ নদে।

প্রিয় মধুকবি, তোমার জীবনব্যাপী অন্তহীন অবমাননা
দুঃসহ-চরম-দারিদ্র ও ক্ষত ব্যথায় তোমার অশ্রুর ভাসানপর্বে
ধুতি-চটিতে অস্থির-চিত্ত উন্নতশির একজন মানুষ ঈশ্বর
সুগভীর 'মাতৃস্নেহের' দেবদূত দ্রুত পৌঁছে যান তোমার কাছেই।
তোমার খাগের কলমে, নিবে, স্বতই ফুটে ওঠে স্বর্ণ, স্বর্ণাক্ষর
লিপিমালা : 'করুণার সিন্ধু, তুমি... দীন যে দীনের বন্ধু...'
প্লাবনের শেষ নেই—মধুবায় ভেসে যায়, যায়—রক্ষপুরী—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার—মেঘনাদ—অমিত্রাক্ষর—ব্রজাঙ্গনা,
বীরাঙ্গনা, শর্মিষ্ঠা, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের
ঘাড়ে রোঁ, চতুর্দশপদী, কৃষ্ণকুমারী..., দ্য ক্যাপটিভ্ লেডি বা
ইংরাজি নীলদর্পণ—কোথায় না কন্টক—সুতীব্র ঝড়!
আজও প্রমীলারা ভাষা পায় প্রমীলার কাছে। প্লাবনের

শেষ নেই, —মধুবায়ে ভাসা শুধু? বানভাসি—ভেসে যাই—যাই—
'মধুনাম' লিখে আজও ঋষি বঙ্কিমের সেই পতাকা ওড়াই।

অপরিচিত
প্রশান্ত চক্রবর্তী

অপরিচিতরও সামান্য পরিচয় থাকে
থাকে ছোট্ট পরিসরের জানালা
গলিঘুঁজি আকাশের ফালি
তীব্র বৃষ্টির সমাবর্তন

অপরিচিত জানে অধিক পরিচয়ের দায়
অন্ধকারে রৌদ্রবোধের দিগন্ত
মায়াময় ঘরের সীমানা
সপ্তর্ষিতে আলোকিত হেমন্তের পাতা

অপরিচিতরও গুটি কয়েক বাতিস্তম্ভ থাকে।

কুচিয়ার চিঠি
অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিকে বাসন দাও। মাজতে দাও এ যাবৎ ভালো ভালো পাহাড়
নরম হাতের কাছে যেন কিছুই নয় বৃক্ষের বাড়াবাড়ি।
সমস্ত মিথ্যে কথা।

তুমি ভিক্টর দেখোনি। কুজুরও না। শুধু কবিতা লিখলে এসব জানা যায় না।
আরেকবার ঋণের কাছে যাও। বারি বসাও চোখের চারপাশে।

আমরা মাতোয়ারা হয়েও সব লক্ষ্য করেছি
আর ভুলে গেছি এখানে পাহাড়কে আরও সুন্দর করতে
এসে থাকেন রমনীরাই। মানুষ সামলাতে।
মহুয়া সামলাতে
কোন কোন বৃক্ষের নাম দিতে সজল শ্যামল।

কবিগুরু, তোমাকে

বাসন্তী দেবনাথ

তেজদীপ্ত মধ্যাহ্নে তুমি ডাক পাঠালে
যেতে আমাকে হবেই।
তোমার ঘরে আজ বিশ্ববরেণ্যরা আসবে
আঙিনা ঘিরে বসবে—গুণী সমাবেশ
প্রশংসার আপ্তবাক্যে আমরা স্নাত হব;
মাহাত্ম্যের—পুণ্যলগ্নে কানায় কানায় ভরে উঠবে আসর।

বল কবি,
তোমাকে সমাদর করার ধৃষ্টতা কি আমাদের আছে?
আমরা কেবল নিতে জানি
কসাইয়ের মত নিতে জানি বলে, আমাদের এত জৌলুস!
তোমাকে পণ্য ক'রে প্রতিদিন আমরা বেঁচে থাকি,
অথচ তোমার ছায়াতলে থেকেও—
অন্য একজন মানুষকে আমরা মানুষ করে তুলতে পারি না;
আমাদের দৈন্যের শেষ নেই।

শোন কবি,
পৃথিবীর আকাশে বাতাসে তোমার সুর যতই বাজুক না কেন
এদের অনেকেই তোমাকে ভালোবাসে না,
আজকের দিনে যে আড়ম্বর দেখছ—সবটুকু ভাঁড়ামি
নিজেকে আলোকিত করার এ এক ভিন্ন প্রয়াস।
তুমিই বল কবি,
তোমাকে ভালোবাসলে কি
নির্যাতিতার অসহায় কান্নায় ভরে উঠ্‌ত আকাশ বাতাস?

এ ভারতবর্ষ! কবিগুরুর বাংলাদেশ!

চলে গেলি নিতাই

শেখ আবদুল হকচাষী

চলে গেলি নিতাই, নিতাই মাঝি
কাশিশ্বর মাঝির বড় পুত্র—এই
গ্রামেরই প্রতিবেশী, বাল্যবন্ধু
তোর কাছেই শিখেছিলাম তুলসীতলা
নারকেল নাড়ু লক্ষ্মী সরস্বতী ছাপ।

গতকাল দেখলাম নারকেল
গাছ, কলাগাছ, লাগালি বাড়ি,
কুমড়ো গাছে 'বাউনি' দিলি
সকালে দেখি, নাই—ঘরবাড়ি
আছে দরজা আঁটা, ভিতরে
মানুষ নাই—চলে গেলি

ঘর লাগোয়া নদীটা তো
আছে—ইলিশের ঝাঁক
ঘাটে নৌকা, চড়াটে জাল
তুই ক্লাশের বন্ধু—বাল্যবন্ধু নাই
চলে গেলি, তুই চলে গেলি নিতাই।

পথ

বিজয়

পথের মাঝে জীবন এনে রাখি
পাখি নয়, তবু আমি পাখিই
দিনের আকাশে উড়ে ফসলের করি খোঁজ
ম্যারাথন ছুটি আকাশের মাঝে
মেঘেদের আনি রোজ।

সারাজীবন পথেই গেল কেটে, ঘর!
দিবস রজনী, জীবন, জীবনভর।
রাস্তার পিঠে গড়িয়ে চলে যোজন শরীর চাকা
বিরাম নেই, দোসর খুঁজি নানা অজুহাত মাখা।

পথেই এসে জীবন সবাই চেনে
তখন শরীর বুঝে যায়
ক্লান্ত দৌড়ানোর মানে।

পথিক

অরূপ পান্তী

তুমি তো দেখালে সব
আমি নিজেকে এখন আয়না ভাবি
চিবুক, বুক, রংবাহারী ঔদাস্য এবং চিহ্নগুলি
আয়না বলে এখনও তুমি সুন্দরী
এক দ্বিতীয় আনন্দ ও অজানা আগুন স্বাদ
শিল্পীর রং-এ রঙিন ক্যানভাস

নিঃসঙ্গতা মানুষকে শিল্পপথে টানে
কেউ কেউ শিল্পের ভিতর দিয়ে বাঁচতে চায়
পূর্ণতা বলে কিছু নেই,
খন্ডতা বলে কিছু নেই
জীবন এক নদী, অসংখ্য বাঁক
জীবন মানে প্রতিশ্রুতি ও দীর্ঘশ্বাস

জীবনের আয়না ভেঙে যাচ্ছে ক্রমশঃ
আর শিল্প দেখাচ্ছে পথ
তুমি তো দেখালে সব
তুমিই তো দেখালে সব।

সাধ

নীলাঞ্জনা প্রামানিক

ফিরে যেতে সাধ হয় তারা ঝিকমিক রাতে
যেখানে নিষ্পাপ বালিকা মন দাঁড়িয়ে রয়েছে একা।
ফিরে যেতে সাধ হয় নিশ্চিত রাতঘুমে
যেখানে রয়ে গেছে সুখস্পর্শ মা র স্নেহমাখা।

ফিরে যাবার সাধ বুকে নিয়ে বাঁচি
অপূর্ণ সম্ভাবনাহীন সাধ মাথাকুটে মরে
তিলে তিলে ক্ষয়ে যায় ব্যস্ত জীবন বাঁধনে
তবু সাধ সাধ্য হতে চায় মনের গভীরে।

আমার জন্য
নন্দিতা সিন্‌হা

তুমুল অভিমানে সে আমাকে একদা লিখেছিল
তোমার জন্যে আমার কৌমার্য হারিয়েছে
আর কিছু করার ছিল না,
তখন বালিশ বুকে কেঁদেছিলাম,
কাঁদতে কাঁদতে হেসেছিলাম
তৃপ্তি, অহঙ্কার মিশে যাচ্ছিলো সে হাসির রেণুতে।
তারপর কতো রাত, কড়া নেড়েছে দুয়ারে
আধো ঘুমে, জাগরণে
মনে হয়েছে এমন একটা প্রেমই পারে
পুরো জীবনটাকে টেনে নিয়ে যেতে
সাগরের ঢেউ বেলাভূমিতে আছড়ে পড়েছে
আমি ভেবেছি—আমার জন্যে
তুমুল ঝড়ে বেসামাল গাছ-গাছালি
শিকড় ছিঁড়ে মাটিতে শুয়ে কেঁদেছে...
আমি ভেবেছি—আমার জন্যে
ভোরের আলো পাকা আমের মত
পুব আকাশে—সব আমার জন্য
'আমার জন্য' শব্দটা অহঙ্কারের মত মিশেছে
বছরের পর বছর
এখনো কদাচিৎ মনে পড়লে দেখি
শক্তি হারায়নি শব্দ দুটো
আস্ত একটা কবিতা লিখিয়ে নিতে পারে
তুমুল গরমের পর বৃষ্টি নামলে।

দেওয়াল লিখন
প্রবীর চট্টোপাধ্যায়

দেওয়ালে লিখলে অনেক
এবার দেওয়ালের লেখা পড়ো

প্রকৃতি কখনো ফুরায় না
সূর্য থেকে নক্ষত্র অধিকতর

বিলীন রয়েছে যত শূন্যে
যা কিছু দেখি, সে তো তারই বৃষ্টি

আগুন থেকে ধরে আগুন
তবু দাবি করি এ আমার সৃষ্টি।

আসলাম সানী-র দুটি কবিতা

প্রেম সুপার হাইওয়ে

আজ সন্ধ্যায় তুমি এলে না মেয়ে
বিকেলটা ছিল বড় উজ্জ্বল
লেকের ধারে অতিথি পাখিদের ভিড় ছিল
তোমার মুখ ছিল বড় ধূসর
জলেরা ছিল স্থির, তবু তোমার মুখের আদলে
কাউকে দেখিনি আর।

কী ব্যস্ততা ছিল লাইব্রেরিতে, সে তোমার
নোটখাতায় কি লিখছিলে আজ?
কেবল আঁকিবুকি কাটাকুটি খেলা,
কুয়াশার প্রেম ভেদ করে
শীতের পাখিরা আসে তবু
মেয়ে তুমি এলে না এই বেলা।

রাতের ক্লান্ত নিকোটিন নিয়ে
কী বিষণ্ণ কেটেছে সময় আমার
কবিতার খাতা শূন্য রেখেই টেবিলে ঝিমুই আমি।

স্বপ্নগুলো এলোমেলো সব, বেহিসেবি সময় কাটে
বাদামের খোসা পেরিয়ে আমি এসেছিলাম লেকের ধারে
মেয়ে, তুমি আসোনি, তাই আসেনি রাত
থেমে আছে সেইখানে।

অ্যাম্বুলেন্স্‌টা করে আসবে

সমুদ্রে ঝড় উঠলে
চলন্ত জাহাজের নাবিকেরা যেমন সতর্কবাণী পায়—
গুটিয়ে নেয় নিজেদেরকে,
আকাশে ঝড় ওঠার আগে যেমন
বাতাসের বেগ বেড়ে যায় আর

পাখিরা ফিরে যায় আপন নীড়ে—
তেমনই আমার জীবনে ঝড় উঠলেও কি
তুমি কোন পূর্বাভাস পাও?
নাবিক কিংবা পাখির মত নিরাপত্তার আশ্রয় খোঁজ?

পেসেন্টকে দেখলেই কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতো
বলে দিতে পারো আমার কি রোগ ধরেছে?
এক্সরে যন্ত্রের মতো কি ধরা দেয় তোমার চোখে
আমার হৃদয়ের রোগগুলো?

অথচ তোমার হৃদয়ে সারাক্ষণ
একটি আবহাওয়া যন্ত্র বিরাজ করে
ওসব অভিজ্ঞ ডাক্তারদের চেয়ে আগেই তুমি
বলে দিতে পারো কোন রোগের নাম।

এক্সরে যন্ত্রের চেয়ে তীক্ষ্ণ, সজাগ তোমার দৃষ্টিশক্তি
তাইতো তোমার চোখের পাওয়ার লেন্সে
এক নিমিষে ক্লিক করো আমার সমস্ত রোগগুলো,
আবহাওয়া অফিসের মতো সিগনাল দিয়ে দাও
বাতাসের গতি নিরূপণ করে সাইরেন বাজাও।

আমার মৃত্যুর আগেও কি বলে দিতে পারবে
কখন আমার যাওয়া হবে, অ্যাম্বুলেন্সটা কবে আসবে?

সিরাজুল ইসলাম জীবন-এর তিনটি কবিতা

ব্যাধের শর

সে চলে গেল করুণ অভিমানে গোধূলি বেলায়
ধান-দুর্বার আয়োজন এখনো হয়নিকো শেষ
ঘোমটা খসার কাল; এখনো দুয়ারে দাঁড়ায়ে ননদীকুল
যমুনাকূলে এখনো শোনা যায় বিরহী করুণ সুর
কার বাঁশি বাজিল শ্রাবণ-বর্ষণের তালে তালে,

ঐ পাপিয়ার একটানা সুরে আমিও ব্যাকুল বিভোর।
মনে পড়ে গেল কবেকার সেই তমসা নদীর তীর;
বাল্মীকির ধ্যান ভেঙেছিল যে গোধূলি লগন,
মিথুনরত ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর অভিসার কাল;
আচমকা ব্যাধের শরে রক্তাক্ত বিরহী ক্রৌঞ্চ তখন,
বিরহী ক্রৌঞ্চীর বেদনাঘন ঘূর্ণন ক্রন্দনকলা;
চিত্রকল্প হয়ে বারবার ভেসে উঠছে আমার আঁখিপল্লব ঘিরে।

মার্জনা

পঞ্চশরে দগ্ধ করেছি তোমার করুণ হৃদয়খানি
তারও আগে দগ্ধ হয়েছি অজস্রবার আমি
তবু কাঁটার আঁখিজল ফুল হয়ে ঝরে পড়ো হায়!
দময়ন্তীর কাছে কতবার ছুটে গেছে মায়াহাঁস
কতবার ছুটে গেছে রাজা নলের বেদনা মধুর ভালোবাসা—
রাজা নলের মতো কোনো মায়াহাঁস নেই তো আমার
নেই একটা বলাকার পাখা—
আমার আছে কেবল আকাশ-বাতাস প্রেম-পারাবার,
এ- কোন মায়ামৃগ তুমি লুকাতে চাও গভীর অরণ্য-অভিমানে
ক্ষমা করো প্রিয় আজিকার এই দীনতাটুকু আমার।

দেবযানী

সাগর মন্থন করা বিষ পিয়ে নীলকণ্ঠ শিব আমি
কচ-নয়নে দেখি সীমাহীন মুগ্ধতায় দেবযানী তুমি।
সবটুকু অমৃত নিয়ে গেলে দেবতারে দিবে বলে
আমিও রাখিনি এককোঁটা, অসুর হতে চাইনি বলে
তরল-গরলে প্রেমপূজা কে পারে সাধিতে?
যে পথে গিয়াছ চলে ফিরিবার নাহি সময়
ম্লান বদনের আঁখি ভরা জল ঢেকে দিও আঁচলের ফুলে,
আর দ্রৌপদীর লীলাপদ্ম হাতে ফেলে দিও অবুঝ প্রণয়।
আমার এই নীলকণ্ঠ গাঢ় নীল হবে জানি জানি
কচ-নয়নে তবু হাজার বছর চেয়ে রবো দেবযানী তুমি।

মাহমুদ কামাল-এর দুটি কবিতা

দিনগুলো কোথায় যে যায়!

দিনগুলো কোথায় যে যায়!
রাতের আঁধার শেষে
প্রতিবার ফিরে আসে নাকি!
দিনের বয়স বাড়ে কি কখনো?
হায় রে মুহূর্তমা
তোমাকে যায় না ধরা
মুহূর্তে মুহূর্তগুলো যোগ হয়ে
সময়কেই পূর্ণ করে তোলে।
গাছ বেড়ে ওঠে, ফুল পাখিসহ
প্রতিটি মানুষ
সময় কি বেড়ে ওঠে?
দিনগুলো কোথায় হারায়!
মেঘের আড়াল থেকে
যেই মতো উঁকি দেয় আলো
সে ভাবেই ফিরে আসে নাকি?
দিন-রাতের হিসেব
প্রকৃতপক্ষে কেউ মেলাতে পারে না?

সাদাই তো ছিল

সাদাই তো ছিলো
রঙের প্রলেপ দিয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধির
যে তুলির আঁচড়ে প্রস্ফুটিত হলো
প্রকৃতপক্ষে তা কালিমা লেপন।
এ রকম চিত্রগুলো বিচিত্র হয়ে
হেসে ওঠে যেন ক্রুর হাসি...
সাদাই তো ভালো ছিলো
ভুল ব্যবহারে রঙেরও অর্থ বদলে যায়
লাল-নীল-সাদা-কালো
বদলে যেতে যেতে
অবশেষে পড়ে থাকে
'ছেঁড়া টুকরো মেঘ...'

হৃদয়গ্রন্থি

গোলাম কিবরিয়া পিনু

নদীকে বলেছি—'নদী বড় হও'।
নদী বলে—'আমি জল ছাড়া বড় হই না
যত জল তত বড়।'
মানুষ কি একা বড় হয়?

প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে নদী আরও বলে
জল ছাড়া আমি অবলুপ্ত হই
বাতিলও হই
বিনাশও হই
কুলরক্ষা হয় না।
কালগ্রাসে পড়ে কালসমুদ্রে হারিয়ে যায় কত নদী!

তালপুকুরও খালবিলও জল দিয়েছে
আমি প্রফুল্ল হয়েছি,
ঝরনার জল পেয়ে ঝরঝরে
আকাশভাঙা বৃষ্টির জলে চনমনে
প্লাবনের জলে তাজা
ভূগর্ভস্থ জলে টলটলে।
জলই উচ্চতা বাড়ায়—জলই গভীরতা বাড়ায়!

একটা পোড়োবাড়ি থেকে জলগ্রন্থি খুলে
যেন প্রসারিত হয়েছিলাম।

তারপর মরুপথে
গিরিপথে
বনের ভেতর দিয়ে
জলের সাহচর্যে কুণ্ঠাহীনভাবে আমি প্রবহমান।
জলের কপটতা নেই—জলের কুম্ভীরাশ্রু নেই!

আমি শুধু এইটুকু জানি
জলের উদারতায় উদার প্রকৃতি হয়ে উঠি
উর্মিমুখর হয়ে উঠি
কল্লোলিত হয়ে উঠি
হৃদয়গ্রন্থি খুলে ধরেছি আমিও!

রাতদুপুর

আদর্শ ইসলাম

ঘুম আসছে না বলে
রিমঝিম এই বৃষ্টির শব্দে,
ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগাতে
হঠাৎ রাতদুপুরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

যেতে থাকি ভাবনার গভীরে
পৌঁছোই এক কল্পনার জগৎ,
ছুঁয়ে যায় হঠাৎ বৃষ্টির ছাঁট
ফিরে পাই এক রাতের বাস্তব।

শব্দ
নীপা চক্রবর্তী

একটি শব্দ খুঁজে চলেছি
কবে থেকে ঠিক মনে নেই
বছর বা মাস নয়
হয়তোবা তিন যুগ...
শব্দটার গভীরতা আছে;
আছে অন্তরের মর্মভেদী হাহাকার
তার কাছে আমি অসহায়!
বিরাট এই বিশ্বে
আমি ব্যতিক্রম নই
আমাকে শব্দটা পেতেই হবে
নিঃশেষ হবার আগে
প্রতীক্ষায় আছি রাত দিন...
সব অহঙ্কার ছেড়ে
খুঁজে পেতেই হবে,
আমি যাই—

প্রিয়তমেষু
স্বাগতা পাল

কণ্ঠনালীতে জমেছে যতটা বিষ,
ঢালো এখনই নিঃশেষে সবটুকু—
আমার কানে নির্দ্বিধায়।
প্রতিটি শব্দ গাঢ় নীল—
উঠবে ফুটে পারিজাত রূপ ধরে
এ মনের নন্দনকাননে। যার—
সন্ধান পেলে না তুমি আজও!
কোনো পরিযায়ী চুম্বনে হয়তোবা—
খুঁজে পাবে তুমি অমৃতের আস্বাদ।

সূর্যপ্রহর
জেবুন্নিসা হেলেন

চুপ চুপ একটু শব্দও করো না
দেয়াল শুনতে পাবে।
দোহাই তোমার, একটি কথাও আর নয়
একটু সাহসও দেখানো নয়।
ভালোবাসার আদর অনাদর থাক
নিজের ভেতর—

এখনও ডাকেনি ভোর,
হয়নি সূর্যপ্রহর।

মৈনাক দত্ত-এর দুটি কবিতা

বিকেলের আলো

বিকেলের আলো আঁকে ছায়াপথ
ঘুম ঘুম শহরের শরীরে
নিঝুম আধোচেনা জনপদ
আমিও তুলে রাখি কুড়িয়ে,
(তোর সাথে দেখা নেই একযুগ
তবু তোর মুখ খুঁজি রোজ রোজ
সূর্য তাই দেখে বুঝি দেয় ডুব
মেঘেদের কাছে চলে তোর খোঁজ)
বিকেলের আলো বড় মায়াবী
শহরও জানে তা আলবৎ
তাই সে মেখে নেয় যত পায়
আমিও ভরে নিই দুই হাত,
(তোর সাথে কথা নেই আট মাস
তবু তোর কথা শুনি বাতাসে
বিকেলের আলো বড় মায়াময়
ছায়াছবি এঁকে চলে আকাশে)।

এখন যখন তুই আছিস পরবাসে

এখন যখন তুই আছিস্ পরবাসে
আর আমি হট্টমেলার দেশে
তোকে না দেখেই কাটাতে পারি অক্লেশে
মুখ গুঁজে উপন্যাসে
গোটা এক প্রেমের মরসুম,
(তারপরেও এপিলোগ যাবে রয়ে)
তোর জানালায় ভরা দিন সয়ে সয়ে,
এক শ্রাবণ কি দুই আশ্বিন,
আরও বছর তিন,

তারও পর তুই হবি মিউস
আর আমি?
আরেক প্রমিথিউস, (মাটি থেকে গড়ব মানুষ
একে একে গরম লোহা
আর হাপরের টানে,) আসবে ঠিক জিউস
সাথে পান্ডোরা
আরও কিছু বছর যাবে কেটে
আরও কিছু শহর হবে ঘোরা,
(তারপর একদিন দেখবি ঠিক)
কেমন যাবে মিলে সব
তোর পরবাস
আমার শৈশব,

হারানো যা কিছু
দেখিস কেন নেবে পিছু
জানলা ভরা দিন
(তোর সিল্যুট
আমার পাতায়
তোর আঁচড়ের টান)
এক শ্রাবণ কি দুই আশ্বিন।

নীলকমল

কাজরী চ্যাটার্জি

অন্ধ বাউল গান গেয়ে যায়—তার নিত্য আনাগোনা—কখন বলো নীলকমল—তোমায় হলো চেনা? চেনার মাঝে অচেনা সুর—তবুও কেন বাজে—আমার দিন কাটে না—জাবর কাটি সকাল হতে সাঁঝে—

নীল কমল নীলকমল আমি তোমার কাছে যাব, আজও তুমি আমার কথা কেনো এত ভাবো! কত জন্মের সাথী ছিলাম, ছিল দীর্ঘদিনের বাস, তোমার চোখেই লেখা হোল আমার সর্বনাশ?

আমি যখন ঊনিশ কুড়ি, আমি যখন পরী, হঠাৎ দেখা হয়েছিল অরুন্ধতীর বাড়ি—আজ সে মেয়ে ভালোই আছে, আকাশ তার বর, আমার শুধু পুড়লো কপাল, উঠলো কেনো ঝড়?

কাল কি হবে আজ কি হলো ভেবেই সারা হই, নীলকমল তোমার মত প্রাণের মানুষ কই? প্রথম যেদিন দমকা ঝড়ে উড়িয়ে নিল সব, ভাঙ্গল বাঁধন স্বপ্ন যত প্রাণের কলরব—

এখন আমি বিদেশিনী, আর গাঁয়ের মেয়ে নই—নীলকমল কোথায় তুমি, আমায় পাগল করো কই—আজ পায়ে আমার সোনার বেড়ি, রাজেন্দ্রানীর সাজ, নীলকমল তোমার কিসের তাড়া, বলো কিসের এত কাজ?

যখন চিনলে নতুন করে একটু খানি বোসো, মান করে আজ যতোই তুমি আমায় কেনো রোষো—শুনতে তোমায় হবেই সব, অনেক কথা বাকি—স্বপ্ন ভেঙে খানখান তবু মিথ্যে ছবি আঁকি।

তোমার মনে আছে? একটা নূপুর হারিয়েছিল, ওই যে নদীর পাড়ে— সেদিন লুকিয়ে বাঁশি শুনিয়েছিলে তমাল গাছের আড়ে—জানো সেই নূপুরটা খুঁজে বেড়াই মনে মনে, নদীর পাড়ে ছুটে যাই তাই তো ক্ষণে ক্ষণে—

যেদিন আমি নিলাম হলাম, আমার রাজপুত্তুর বর—মুহূর্তে সব ভাঙল বাঁধন জীবন অনুর্বর—স্বপ্নগুলো এক এক করে ভাঙল চোখের জলে, চার হাত আর এক হলো না, বাঁধন গেলো খুলে—

এখন আমি কৃষ্ণপ্রিয়া, রাঙা মাটির বউ—নীলকমল তোমার মত ভালোবাসেনা কেউ—নরম মাটির মেয়ে ছিলাম, আজ কাঁকর মাটির কেনা, ভালো করে দেখোতো তুমি, চিনতে পার কিনা?

আমার আজও বুকে আগুন জ্বলে, আমি তোমার কাছে যাব— নীলকমল নীলকমল বলো কেনো আমার কথা ভাবো? স্বপ্ন ছিল নদীর পাড়ে দু-জনে বাঁধবো ঘর-সুখের ঘরে হঠাৎ এসে ঢুকলো কখন ঝড়—

আজ রাত জেগে তাই কবিতা লিখি পাতার পর পাতা, শূন্য বুকে নীলকমল ভরিয়ে দিলে খাতা—খাতার পরেই এসো তুমি, প্রাণের পরে বসো, এমনি করেই আগুন জ্বেলে আমায়

ভালোবেসো
নীলকমল
নীলকমল
আমায় একটু ভালোবেসো
একটু ভালোবেসো
একটু ভালোবেসো।

বীর্যশুল্কা

আশিস ভৌমিক

কুলকুল শব্দে বয়ে যাওয়া কূলটা নদী
চোখ ইশারায় ডাকে।
আমি বলি, 'যা না তোর সাগরের কাছে!
কেন বয়ে বেড়াস সবার বীর্য নিজের দেহে নিয়ে?'
নদী কলকলিয়ে হাসে।
বলে, 'জোয়ার ভাটায় শরীর জাগে বলে।'
আমি যাই রেগে, 'নষ্টা মেয়েছেলে!
আসব না আর পাড়ে।
এই কবিতার খাতা দিলাম আমি ছুঁড়ে।'
নদী হেসে বলে কপট অভিমানে,
'তবে মজিস কেন আমার রূপের কাছে,
বুঝি মন ভরে না স্রোতে!'
মুখ ফিরিয়ে বলি অভিমানে,
'বেশ তো ছিলি স্বচ্ছতোয়া পাহাড় থেকে নেমে!'
ওর মুখে কালো মেঘের ছায়া পড়ে।
গুমোট বাতাসে দীর্ঘশ্বাস ভেসে এসে বলে,
'সভ্যতার ক্লেদ নিয়েছি বুক ভরে।
মিলব যখন সাগর নোনা জলে;
সব বীর্য দিয়ে যাব জমা ছোট্ট এক দ্বীপে।
কল-কাকলিতে ভরে যাবে দ্বীপ কুরু-পাণ্ডব লয়ে।
আর আমি!
যাযাবরী বীর্যশুল্কা নারী,
শুদ্ধ দেহে যাব সাগর সঙ্গমে।'

অতৃপ্ত প্রত্যাশা

সুদামকৃষ্ণ মণ্ডল

আজীবন পূর্ণতার সপ্তর্ষিমণ্ডলে খাঁচাবন্দী পাখি,
মধ্যরাতের নীলচে আলোয় বঞ্চনার উল্কা ঝরে,
কখনও ঔদ্ধত্য-অতৃপ্তির শ্বাস অগ্নিশিখায় অবারিত
দ্বারে লকলকে জিভে মিশে যায় প্রত্যাশার লোলুপ হাত।
কখনও নারী মা হতে কুচনী হয়, কখনোও নাতিশীতোষ্ণ
বক্ষে ডুব দেয়, লোনা পানির স্বাদে হিংস্রতা বাড়ে।

সম্পর্ক

ভীম ঘোষ

প্রতিদিন চোখের কোনে কোনে ঝরছে জল
জলের স্রোতে
হারিয়ে যায় সময়, মিছিলের পায়ে পায়ে,
বুক ভাঙছে পাথর, পাথর ভাঙছে বুক
বুক জুড়ে হাহাকার।
জানালা খুলে দেখি, অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে আছ,
জীবন দাঁড়িয়ে আছে মাঝ পথে, সাঁকো দুলছে।
দাঁড়ি, কমাতে শেষ হয় রাত।
বর্ণহীন চেতনায়, অতৃপ্ত সম্পর্কে।

স্মৃতিটুকু নিয়ে

প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেলে আসা স্বপ্ন যেন
বিদ্রুপের হাসি হেসে যায়
আহত বিহঙ্গসম পড়ে থাকা মাঠে
অস্ফুট আর্তনাদে।
ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনির
নিঃশব্দ কান্নায়।

ফুল ফুটেছিল গহন অরণ্যের কোনে
অবেলায়।
স্নিগ্ধ সুগন্ধ নিয়ে লুকিয়েছিলাম
অদৃশ্য কবরে।
স্মৃতিটুকু নিয়ে।

অমরকুমার দাস-এর দুটি কবিতা

অনেক কথার মালা

চোখের দর্পণে ভেসে ওঠে
মনের ছবি
মনের ভাষা ছুঁয়ে যায় অবয়ব
অবয়বে অনেক আশার আলো
অনেক গল্প অনেক কথার মালা
কাব্য হ'তে মহাকাব্যে আশ্রয় নেয়

দোটানাতে

তোমার মনের দোটানাতেই
মহাযুদ্ধের ঘোড়া
একাল সেকাল পরকালে
লড়াই ঝগড়া বাধায়

মনের জনকে ভুলতে গিয়ে
অনেক ব্যথার গল্প
তোমার মনের সভাঘরে
বিষণ্ণ মুদ্রিত।

এবার বোধহয় হারিয়ে গেলে
মনের দাবানলে
সবুজ দিনের পাপড়িগুলো
অজান্তে ঝরিয়ে দিলে

একটা সময় স্মৃতির আভায়
প্রাসাদ প্রতিম কষ্ট
ভাসিয়ে দিল সবুজ শিশির
সূর্যস্নাত মন্ত্র।

বিকশিত

সুপ্রিয়া চক্রবর্তী

ভাগ্য যদি টেনে নিয়ে যায়
উচ্চতার শিখরে,
অহংকার কোরো না কখনো
সাধারণ থেকো অন্তরে।
কোনো কিছুই থাকবে না
থাকবে শুধু ব্যবহার,
অহং পরিহার করো
বিকাশ হোক মানবতার।
অন্তর হোক বিকশিত
ফুলের মতো সুগন্ধে,
মনুষ্যত্ব, ভালোবাসায়
ভরবে হৃদয় আনন্দে।
সবার আশীষ মাথায় নিয়ে
চলার পথের হোক প্রসার,
বিদ্যা তোমায় দেবে বিনয়
জয় হোক জয় ভালোবাসার।

জীবনতরী

মায়ারানি সাহা

১.
নামের সাগরে ভাসায়ে তরী
কে বেয়ে যায়রে,
আয়রে তোরা আয়রে সবে
একবার দেখে যারে।
তরী হেলিয়া দুলিয়া চলে
চলে ধীরে ধীরে,
উথালি পাথালি ঢেউয়ে
সে তরী হারায়ে যায়রে।
তরীর মাঝি যে জন সে তো
তুমি আমি না, হাল ধরি
বইসা আছে, তার শিখীচূড়া,
আর গলে মণিমালা
হাতেতে বাঁশের বাঁশি,
বসিয়া একেলা।
সে যে তরীর হাল ধরেছে,
এবার তরী নড়ে নারে।
নামের বানে ভাসে তরী
ভবসাগর মাঝেরে।

২.
আমি বইসা আছি ঘাটের কিনারে
কূলে চাইয়া চাইয়ারে
পাগলা হাওয়া মোরে
পাগল করলো রে।
দিকে দিকে বইয়া যায়
হাওয়া ধীরে ধীরে
পাগলা হাওয়া মোরে
পাগল করলোরে।
ওই দেখ না আকাশ পানে
পাখিরা সব উড়ে চলে,
মনে নাইরে শান্তি,
কত কথা তারা বলে
দূর গগনে মেঘের মাঝেরে,
তারা বুঝি যায় অভিসারে।
কত কথা মনে পড়ে
তাদের বারে বারে।
আকাশ পথে ছুটে বেড়ায়,
কী দুখ সাথে লইয়ারে
কী দুখ সাথে লইয়া, যদি
দেখতে পাইরে, যদি
দেখতে পাই।
কুলের হাওয়া করল আকুল
মোরে বারেবারে রে
মোরে বারেবারে।

হকার

অলোক শ্রীমানী

(সানসাইন্ অপারেশন্ অবলম্বনে)
কাব্য নীরস মুক্তির নিঃশ্বাসে
শব্দের ছবি এঁকে হবে কি?
ফুটপাতে ভালোবাসা
নূতন যুগের আশা,
মন্ত্রীর উৎপাতে
সকলের চিৎকার—
ছিলাম ছিলাম ভালো
আর নেই দরকার
বাড়ি হলো, গাড়ী হলো
পাবে কি গো এত ভালো সরকার।
অনাচার ব্যাভিচার আগে নিত জমিদার
এখন তো লোকাচার
বিশ্বাস, যদি বলে ভাববো কি?
কাব্য নীরস-মুক্তির নিঃশ্বাসে
শব্দের ছবি এঁকে হবে কি?
হ্যারিকেন, লণ্ঠন,
শুরু হলো বন্টন
আলো দেখে আলেয়ার
পাই যদি লাগাতার।
'মুখোশ' মুখোশে ঢেকে
সুযোগ হারালে শেষে,
আমার কি হবে দশা,
ফুটপাতে ভালোবাসা
সমাজ দর্পণে দেখবে কি?

বয়স একুশ

পল্লব দাস

দিন দিন কেমন আবছা হয়ে যাচ্ছে
পাঠ্য বইয়ের সমস্ত চরণ
মায়ের কথা, তার অন্তরালে রয়েছে নাকি
শুধুমাত্র ঐ একটি কারণ।
আমি সেই কারণ জানতে
সুধাই, আমার কি রয়েছে কোনো ভুল চুক
মা বিদ্রুপ হাসিতে বলে ওঠে,
সবকিছুর মূলে ঐ ফেসবুক।
নারীর প্রলোভনে খুলেছো ফেসবুক
যা দিয়েছে তোমাকে সাময়িক সুখ,
যার নেশায় ভুলেছো বইয়ের মুখ।

নবদীপ

সুদীপা মজুমদার

একে একে নিভল দেউটি
নামল ঘনঘোর নিশি
ভুললাম উজ্জ্বল দিবালোক
চাইলাম মনে করতে
উজ্জ্বল এক দিন ও রাত
যে ফিরিয়ে পারে দিতে
হারানো সকল দিন।

সেই দিনের প্রতীক্ষায়
সর্বদা প্রহরগুনি
যদি জ্বলে ওঠে আবার
একটি মাত্র দীপ
যে দীপের আলোতে
পথ চলব নতুন ভাবে
নতুন পথ গড়ব আবার
ভুলে ঘোর নিশি।

সেখানে

দিশারী মুখোপাধ্যায়

যে আমাকে খুন করেছে
তার পাঁচমহলা বহুতল বাড়িটি গড়ে উঠছে
যেখানে আমার দাফন হবার কথা
আমি কলমীশাকের সঙ্গে লুডো খেলতে চাই
আর সেই খরিশটির নিম্নচাপ সংক্রান্ত
খেলপন
যে আমাকে প্রসব করেছে
তাকে খুন করে আমি গিরগিটির কৃতকর্মের
জেরকে শূন্য করার চেষ্টায়
না জেনে বুঝে
ভালো করার চেষ্টা করবো না
ক্রিয়াপদের চুকিৎকিতে।

বর্ডার

তৈয়েব মণ্ডল

অর্বাচীন মেঘটার থেকেও ওপরে ওঠো
ওটাতো একটা মাত্র দেশেই ঘোরে
আরও ওপরে উঠে দেখো
এটা একটা মাত্র দেশ নয়, একটা বড় পৃথিবী।

দেবতা ভাগ ক'রেছিল জল আর মাটি
দানব ভাগ করল মাটিকে
ওরা মানুষের রক্ত খায়, আমরা শেখানো মন্ত্র পড়ি
দেশপ্রেমিক হাতে রক্ত মাখি প্রতিবেশীর

প্রতিবেশীও রক্তবীজ বোনে ভোর ভোর উঠে
সেই বীজের ভেতরে উসখুস করে আগুন
একসময় ফেটে বেরোয়, ছড়িয়ে পড়ে।

আকাশের সব মেঘগুলোকে জুড়ে জুড়ে
একটা চাদর বানাতে পারো—একটা মানব বন্ধন?
মেঘ তার ছায়ায় ছড়াবে স্বপ্নবীজ
ম্যাপ ছিঁড়ে ফেলতে হবে
উপড়ে ফেলব সব বর্ডারের কাঁটাতার
পৃথিবীর প্রতি ঘরে নিজেকে বিলাব আমি
সাড়ে ছশো কোটি প্রাণের সৌরভে আমার জন্মগত অধিকার

চাদরটার ছায়ায় চাই একটাই মাটি
আগে যেমন ছিল।

Fictions by Mainak Dutta

IN SEARCH OF LA RADICE
a literary fiction
Published by
Xpress Publicatons

Online@offline
literary fiction
Published by :
Lifb Publications

Pestilence
An young Adult Fiction
Published by/Cinnamonted

শিল্পী : গোপাল সান্যাল। (পুনর্মুদ্রিত)

সূচিপত্র

ছড়া

আলু দত্ত

মনাদা

আলু বড়ো ভালোবাসে বেঙ্গলী দত্ত
দিন রাত সারাক্ষণ আলুতেই মত্ত
পাড়াতে সবাই তাই সংক্ষেপে তাকে
আলু দত্ত নামে আর পরিচয়ে ডাকে।

সকালেতে খান তিনি লুচি আলু ছক্কা
না পেলে ভীষণ রেগে যান বুঝি অক্কা।
লুচিখান দুইখান, জামবাটি ভর্তি
আলুর ছক্কা চাই, কম নয় রত্তি।
আলুর ছক্কা রাঁধা - সেও এক শিল্প
বাড়িয়ে বলছি নাকো, নয় গালগল্প।
আলুর ছক্কা সব কাটা এক সাইজে
ছোটো বড় না পসন্দ, ফাঁকিবাজি নাহি যে।
কালোজিরা ফোড়নেতে দিয়ে কাঁচালঙ্কা
হিংয়ের ছিটে না দিলে বেড়ে যাবে শঙ্কা।
দুপুরে ভাতের সাথে আলুতে একাক্কার
ভাতে, ভাজা, ঝোল, ঝাল, নাহলে ছিছিক্কার!
আলুভাতে—তারো আছে নানান ফিরিস্তি
একে একে বলি সব, শোনো নানা কিস্তি ঃ

এক - কাঁচালঙ্কা কাঁচা পেঁয়াজ কেটে কুচিকুচি
আলুভাতে মেখে খেতে তাঁর বড়ো রুচি।
দুই - শুকনো লঙ্কা ভেজে সরিষা তেলেতে
ভালো করে তাতে মেখে নাও আলুভাতে।
তিন- পেঁয়াজের কুচি ভেজে অল্প আঁচেতে
আলুর মণ্ডে দাও পরতে পরতে।
চার- তপ্ত তেলেতে ফেলে দাও কিছু জিরা
গরমা গরম মাখো অতিশয় ত্বরা।
পাঁচ- শশা কুচি দিয়ে মাখা সেও বেশ ভালো
মরিচের গুঁড়ো তাতে সামান্য ঢালো।

ছয়- পোস্ত ছড়ানো ছোটো ছোটো বড়ি ভাজা
তা দিয়েও আলুভাতে খেতে ভারি মজা।

নিত্য নতুন আরো কত যে ভাবনা
মাথায় গজায় তাঁর নাহিকো তুলনা।

এক- সরু সরু আলু মুড়মুড়ে করে ভেজে
দুচার বাদাম ভাজা দিও তাতে সেজে।

দুই- চাকা চাকা আলু ভাজা সেও বড় ভালো
রঙ ঠিক হওয়া চাই, হবে নাকো কালো।

তিন- আঙুলের মতো কাটা আলুভাজা 'পিস্'
ইংরাজি নাম তার 'ফিংগার চিপ্স'
সেটাও দারুণ খেতে সন্দেহ নাই
টমেটো সসের ছোঁওয়া দিয়ে- যতো চাই!

চার- চিঁড়ার সাইজে কাটা ছাঁকা আলুভাজা
গাওয়া ঘি ভাতের সাথে খেতে ভারি মজা!

পাঁচ- ছক্কা সাইজে আলু ভেজে পেঁয়াজেতে
গরমা গরম ঢেলে দিতে হবে পাতে।

ঝাল ঝোল এসবের নানা প্রকরণ
দিয়ে আর বাড়াবো না আলু ব্যাকরণ।
সংক্ষেপে আরও কিছু ব্যাপার স্যাপার
বলে দিয়ে সারাংশে যাবো ঘটনার।

অতিশয় সুস্বাদু খেতে আলুপোস্ত
কত তার পদ্ধতি তালিকাটা মস্ত।
বিরিয়ানি যাই হোক—চিকেন মটন
আলু তাতে না থাকলে ভরে নাকো মন।
ঘন ঘন ঝোলে ভাসা ডুমো আলু দম
ঝাল ঝাল বড় ভালো, মাথা ঝমঝম।
শুকনো আলুর দম ধনেপাতা দিয়ে
সেও যে দারুণ স্বাদ পরোটা মাখিয়ে।
নারকোল বাটা আর টক দই মাখা
সেও জিভে জল ধরে যায়নাকো রাখা।
মাংসের ঝোল—তাতে আলু বেশ চাই

নাহলে রান্না বৃথা, বৃথা খাওয়াটাই।
আলুর টিকিয়া—সেও তাঁর বড়ো প্রিয়
না বলা অসম্ভব, যত খুশি দিও।
ফুচকাতে পুরো আলুমাখা ঠাসা চাই
না হলে কলহ লেগে হবে যাইতাই।
আলুর পরোটা— সেও হরেক প্রকার
টক, ঝাল, মিষ্টি ও নানান আকার।
সিঙাড়াতে আলু চাই মসলায় ঠাসা
খোসা ভেঙে আলু খান, তারপর খোসা।
আলুর চাটনি শুধু খাননাকো তিনি
নিরুপায় খান রাঙা আলুর চাটনি।
আলু ভোজনের কথা অতীব মহান
লিখিলে হইবে মহাভারত সমান!
আসল ঘটনা তবে বলি এইবার
শুনিলে সার্থক হবে জীবন সবার।

দত্তর আলু প্রীতি ক্রমে
প্রচারিত হলো গ্রামে গ্রামে।
গ্রাম ছেড়ে শহরে শহরে
সে প্রচার ধীরে ধীরে বাড়ে।
ক্রমশঃ ছাড়িল সীমা দেশ
প্রচারিল নানা মহাদেশ।
নিখিল বিশ্ব আলু মণ্ডল
ঘোষণা করিল তার আলুফল
বেঙ্গলী দত্ত মহাশয়
আলু খেয়ে করে ধরা জয়।
অতএব দেওয়া হলো উপাধি
আলুমহারত্ন-জীবনাবধি!
কিন্তু হয়েছে মুশকিল
চুরি করে খেতে হবে কিল
বয়সটা হয়েছে তো বেশ
ডাক্তার করেছে আদেশ—
আলু খেতে হবে কমসম
নইলে ফুরিয়ে যাবে দম!

ছড়ার ডিম

কার্তিক পাত্র

বাংলা আমার মাতৃভাষা
ইংরাজিটা কি কঠিন
বাংলায় এত কার্টুন থাকতে
বই কিনে দেয় টিন্ টিন্।
নন্টে ফন্টে বাঁটুল দাদা
এরা কত আপনজন
ম্যানড্রেক আর অরণ্যদেব
এদের আবার কি প্রয়োজন।
ইতিহাসের মানুষগুলো
এরা সবাই গত যে আজ
ভূগোলের এই গোলক ধাঁধায়
ঢুকে আমার বলো কি কাজ।
পাটিগণিত আর বীজগণিত
জ্যামিতিতেও খুব কাঁচা
জীববিদ্যা রসায়নেও
নই যে আমি খুব খাসা।
মাথায় শুধু গোবর ঠাসা
আর আছে ঘোড়ার ডিম
তবুও বাবা মুখস্ত করায়
গোটা কতক ছড়ার ডিম।

শিবশঙ্কর বক্সী-র দুটি ছড়া

স্বপ্ন

বলতে পারো গভীর রাতে, কেমন থাকে বইমেলা!
রাতের বেলা ঘুমিয়ে পড়ে কি, সহ্য করে অবহেলা!
বইগুলো সব কেমন হাঁদা,
চুপটি করেই থাকে সদা,
কেউ চায় না পার হতে, পকেটের লক্ষ্মণরেখা
শুধু শুধুই উল্টে পাল্টে, দেখে তারা চোখের দেখা।
স্টল থেকে স্টল ঘুরে বেড়ায়, বই ঘাঁটবার টানে
ধুলোবালি মাখা বই, তাকায় ওদের পানে।
রাত হলে কেউ থাকে না,
ঘোরে প্যাঁচা বাদুড়ছানা,
ঘনাদা ফেলুদা ব্যোমকেশ কি, ওদের পাহারা দেয়!
বেতাল ম্যানড্রেক বাটুলদা কি ওদের সঙ্গ দেয়!
বই বিলাসীর পদধূলি,
বড় বড় কথার বুলি,
টিপ্পনীটা কেটে শুধু, বই পেতে চায় সস্তা দামে
দোকানিরা পড়ছে ঝুঁকে, অবসাদ আর ক্লান্তি ঘামে।

স্বপ্নে দেখি বইমেলাতে, বিকিয়ে যাচ্ছে প্রচুর বই
স্টলে স্টলে বই পাড়ছে, লাগিয়ে দেখি স্টিলের মই।
বই প্রেমীরা কিনছে দেদার,
লেখক প্রকাশক বন্ধু আবার,
বইমেলা ওই হাসছে দেখি, আনন্দেরই সবুজ মাঠে
উড়ছে গেটে বিজয় নিশান, বিশ্বমেলার বইয়ের হাটে।

২১শে

কেউবা বলে ফেব্রুয়ারি, কেউবা বলে মাসটা ফাগুন
'৫২ সালের এই মাসেতেই লেগেছিল বিরাট আগুন।
ভাই-এর রক্তে রাঙা হয়ে, ধরনীতে জ্বলেছিল আগুন,
কেউবা বলে ফেব্রুয়ারি, কেউবা বলে মাসটা ফাগুন।

ভাষার জন্য ঝাঁপিয়ে তাঁরা, চারিদিকে লাগালো আগুন,
দেশবাসীকে ডাক দেয় ভাষার জন্য এগিয়ে আসুন।
মুখের ভাষায় বলছে এবারে কোমর বেঁধে সবাই লাগুন,
কেউবা বলে ফেব্রুয়ারি, কেউবা বলে মাসটা ফাগুন।

সেই ডাকেতে সাড়া দিয়ে সবার মনে লাগলো ফাগুন,
বলছে যেন কেন শুয়ে! ঘুম ছেড়ে এবারে জাগুন।
সবাই মিলে শপথ নিয়ে কোমর বেঁধে একসাথে লাগুন,
কেউবা বলে ফেব্রুয়ারি, কেউবা বলে মাসটা ফাগুন।

রফিক-সামাল-বরকত-জব্বার জ্বাললো প্রতিবাদের আগুন,
সেই আগুনে শপথ নিয়ে, সবাই মিলে কামান দাগুন।
ভগবানের আশীষ আর খোদা তালার দোয়া মাগুন,
সবাই বলে ফেব্রুয়ারি ২১শে, বাংলা মতে ৮ই ফাগুন।

বারাণসী

মানিকচন্দ্র কর্মকার

সুপ্রাচীন কাল হতে এ প্রসিদ্ধ স্থান,
গঙ্গাতীরে অবস্থিত নাম কাশীধাম।
ধর্মপ্রাণ লোকজন আসে এই ধামে,
পাপ তাপ দূর হয় আবাহন স্নানে।
সারি সারি ভিখারিরা বসে রয় তীরে,
তীর্থযাত্রী দান করে যথা সাধ্য ভরে।
নাগাসাধু বসে আছে ছাইভস্ম মাখি,
লিঙ্গে আংটি পরে থাকে নিমীলিত আঁখি।
অবিচল চিত্তে চলে হিন্দু নরনারী,
দেখিয়া না দেখে তাহা ভক্তি সবাকারি।
যুবক যুবতি সবে করিছে প্রণাম,
হৃদয়ে ভক্তি করে মনেতে নিষ্কাম।
ছাইভস্ম টিপ দেয় সবার কপালে,
মস্তকে বুলায় হাত আশীর্বাদ কালে।
উৎসুক নয়নে চাহে যত ফরেনার,
চুপিসারে ফটো তোলে আহা কি বাহার!
গঙ্গাজলে স্নান করে হিন্দু ভক্তজন,
শুদ্ধ চিত্তে পুষ্প হাতে লাইনে দাঁড়ান,
অসীম ধৈর্য ধরে ফুলমালা হাতে,
দুহাতে অঞ্জলি দেয় কাশী বিশ্বনাথে।
পূব হতে ধীরে ধীরে সূর্য যায় পাটে,
সায়াহ্নে আরতি হয় দশাশ্বমেধ ঘাটে।
হাজারো দর্শক ঘাটে হয়ে উপস্থিত,
ভক্তিভরে তালি দেয় মুখে হরিগীত।
ধন্য ধন্য পূণ্যস্থান এই কাশীধাম,
ভক্তিভরে ভক্তজন করিছে প্রণাম।

প্রেয়সী

মঙ্গলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অভাগার কোনো প্রেয়সী জোটেনি
কবিতাকে ভালোবেসে
পথেঘাটে কেউ প্রশ্ন করলে
ভালো আছি বলে হেসে।

এভাবেই কাটে কবির জীবন
ভালো মন্দয় মিশে
কবিও জানে না তার ভালোবাসা
গচ্ছিত আছে কিসে?

কবি তো সাজায় শূন্য পাতায়
কালো অক্ষর সারি
কিছু অক্ষর আপাত নিরীহ
কিছু তো তীক্ষ্ণ ভারি।

অবশেষে দেখে প্রেয়সীও তাকে
হাতছানি দিয়ে ডাকে
অস্তবেলার সূর্য তখন
গোধূলির ছায়া মাখে।

নব উদ্যমে কবিও আবার
সমাজের ছবি আঁকে
অভয়মন্ত্রে সবারে জানায়
চোরাস্রোত কোন্ বাঁকে।

কবির যে আছে তৃতীয় নয়ন
সবকিছু আগে বোঝে
আগামীর কথা কিভাবে জানাবে
তার উত্তর খোঁজে!

তারকেশ্বর চট্টরাজ-এর প্রকাশিত গ্রন্থ

গবেষণাগ্রন্থ

কাটোয়া দর্শন (যৌথ সম্পাদনা), শহর কাটোয়া ও তার সংস্কৃতি,
অভিন্ন শ্রীচৈতন্য শ্রী শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর, কাটোয়া পরিচয়,
জনপদ কাটোয়া, শ্রীরাধাকান্তদেব সিঙ্গারকোণ শ্রীপাট (যুগ্ম রচনা),
শহর কাটোয়ার বনেদি ও বিশিষ্ট পরিবারের ইতিবৃত্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব)
ও মাটিয়ারি রামসীতা মন্দির

কাব্যগ্রন্থ

সুচেতনা রায়, রবি-নারী-আবার সুচেতনা, সময় পৃথিবী,
আঁধার সহবাস থেকে, সুচেতনা রায় (নব কলেবর),
তোমার পায়ের পাতা ও ইছামতি ভেসে যায়।

গল্পগ্রন্থ

ভাঙন, সময় ও হলুদ আকাশের নীচে

প্রবন্ধগ্রন্থ

এষণা

নাটক

নাটক পঞ্চবাণ (এক মলাটে পাঁচটি নাটক)
হঠাৎ সংঘ, বুদ্ধ, আত্মাহুতি, দুধে স্নান, গৌরীস্মৃতি সংঘে এক সন্ধ্যা

ব্যাকরণগ্রন্থ

বাংলাভাষা শেখো (যুগ্ম রচনা) ও হিজিবিজি নয়

সাহিত্যপত্র

'শঙ্খ' ত্রৈমাসিক সম্পাদনা, ১২টি সংখ্যা
'অজয়' ত্রৈমাসিক সম্পাদনা, ১২৫টি সংখ্যা, চলমান

শিবশঙ্কর বক্সী-এর গ্রন্থাবলী

কাব্যগ্রন্থ :

অমৃতধারা

অবগাহন

ভ্রমণ :

চলো যাই

বেড়িয়ে সুখ

চলো বেড়িয়ে পড়ি

বেড়াতে বেরিয়ে

প্রকাশের অপেক্ষায়

উপন্যাস :

মধুরেণ

ভ্রমণ :

সাপ্তাহিক

বেড়াবার বই

প্রকাশক :

সাগরিকা পাবলিশার্স, ১০এ, কলেজ রো, কল – ৯

ওরিয়েন্ট লাইব্রেরী, ৮৬এ, কলেজ স্ট্রীট, চৌমাথা,

ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা – ৭৩

Krishanu Quaterly
Vol XXXXX/I
Rs. 125.00
Regd. No. R.N. 16533/68

মদন দাস কর্তৃক ৩০/১এ, কলেজ রো, কোলকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।